বউ-ডুবির খাল

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৬৪

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্‌-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীধীরেন বল

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
মোহন প্রেস
১, করিশ চার্চ লেন
কলিকাতা ৬

মুদ্রক :
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতাবাগান লেন
কলিকাতা ৬

আমার রচিত 'স্বর্গ হতে বড়' নাটকের আখ্যান ভাগের কিছুটা অংশ এই কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। তবে, 'স্বর্গ হতে বড়' নাটকে যা আছে, 'বউ-ডুবির খালে' তার সব কিছু নেই। আবার 'বউ-ডুবির খালে' এমন অনেক কিছু আছে যা 'স্বর্গ হতে বড়' নাটকে নেই। এই কাহিনীটি একটি ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান সবাক চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন। প্রথম কয়েকদিন আমারি পরিচালনায় কাহিনীটি চিত্রায়িত হয়েছিল। পরে চিত্রপ্রতিষ্ঠানটি তাঁদের ইচ্ছামত কাহিনীটির কিছু কিছু পরিবর্তন করেন। এবং তা ছাড়া বর্তমান গ্রন্থ রচনায় সময় আমি কাহিনীটিকে নানাদিক দিয়ে পল্লবিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তার ফলে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত 'বউ-ডুবির খাল' এবং এই গ্রন্থে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

মোটকথা, 'স্বর্গ হতে বড়' এবং ছায়াচিত্রের 'বউ-ডুবির খাল'— এই দু'টি কাহিনীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে বইখানিকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করলেই বোধ হয় সুবিচার করা হবে। ইতি—

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭।

—মহেন্দ্র গুপ্ত

॥ এক ॥

খোকন ঘুমাও, মানিক ঘুমাও, ঘুমাও যাদুসোনা,
ঘুমের দেশে মামণি তোর করবে আনাগোনা।

ঘুমপাড়ানী গান গায় গাঁয়ের এয়োরা, নদীর ধারে বাঁধানো ঘাটে সাঁঝের পিদিম জেলে।......রশি তিনেক দূরে জটা মেলে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো বট, গাছতলায় বসে শশী পাগলা গাঁজা টানে। রোজ সন্ধ্যেবেলায় সে বউডুবির খালের ধারে এই বটতলায় আসে, গাঁজায় দম দিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে ঘুমপাড়ানী গান শোনে। এ গানের সঙ্গে যেন তার নাড়ীর সম্পর্ক এমনি টান্। হবে না কেন? গাঁয়ের বউ ঝি সবাই এ গান শিখেছে তারই কাছে। বউডুবির খালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে কাহিনীটি শশী মাঝি যে তার জীবন্ত সাক্ষী। সবাইকে ডেকে বারবার শোনায় সেই গল্প,—বড় করুণ কাহিনী। বলতে বলতে শশীর শীর্ণ গণ্ড বেয়ে জলের ধারা নামে, তবু কী যেন একটা আনন্দের অনুভূতি তাকে উত্তেজিত করে তোলে। শ্রোতা পেলেই শশী বলতে সুরু করে ঃ

নদীতে নৌকো বেয়ে যাচ্ছি; চলনদার একটি বামুন বাড়ীর বউ, কোলে তার চাঁদপানা খোকা। চিঠি এসেছে, বৌটির স্বামীর অসুখ। তাই স্বামীকে দেখতে হিজলদিঘি গাঁয়ের কাছারি বাড়ীতে যাচ্ছে বউটি।......সন্ধ্যে হয়ে এল। তিথিটা মনে নেই, দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া হবে; রূপোর হাঁসুলির মত এক ফালি চাঁদ উঠল আকাশে। আবছা আলোয় চিক্‌মিক্ কর্চ্ছে গাঙের জল। দুধারে সবুজ ধানের

ক্ষেতে বেলেহাঁস আর গাঙচিল মাঝে মাঝে ডানা ঝাপ্‌টা দেয়, ছোঁ মেরে পুঁটি মাছ ধরে উড়ে যায় গাঙচিল আর বক।......ঐ তো এসে গেছে। আর গোটা চারেক বাঁক পার হলেই হিজলদিঘির মঠ বাড়ীর চূড়ো নজরে পড়বে।......আয়নার মত পরিষ্কার নীল আকাশ; দেখতে দেখতে কোথা হতে কালো মেঘ ধেয়ে এল, ইন্দ্ররাজার লড়াইএর হাতীর পাল যেন! সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝল্‌কানি। দল বাঁধা কালো হাতীগুলিকে কে যেন আগুনের ডাঙ্গশ মারছে, তারা হাঁক দিয়ে ছুট্‌ছে আকাশের আঙ্গিনায়, কূলোর মত কানে ঝড়ের ঝাপ্‌টানি, শুঁড় তুলে ঢালছে জলের ধারা।......সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে ওঠে গাঙের জল, পাতালপুরীর হাজারো কালনাগিনী যেন গর্জে ওঠে ঢেউএর তালে। পাহাড় প্রমাণ ঢেউ। তার দাপটে ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকো দুলতে থাকে মোচার খোলার মত।......ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে কচি খোকা, বামুন বউটি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমপাড়াতে চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক এসে তার ভয়-কাতুরে মুখের ওপর খেলা করে যায়। সে তবু গান গায়—

খোকন ঘুমাও, মানিক ঘুমাও, ঘুমাও যাদুসোনা,
ঘুমের দেশে মামণি তোর করবে আনাগোনা।

দরিয়ার পাঁচ পীরকে শির্‌ণি মান্‌ত করলুম, মাদুগ্‌গাকে ডাকলুম,—কিন্তু ঝড়ের গোঙানীতে সে ডাক বুঝি তাঁদের কানে পৌঁছুল না। নৌকো বান্‌চাল হয়ে ডুবে গেল মাঝগাঙের রাক্ষুসে ঢেউএর ছোবলে। আঁধিয়ারে খুঁজে পাইনে বউটিকে। খুঁজে পাইনে সেই কচি খোকাটিকে! দুদণ্ড পর ঝড় থামল। গাঙের জল আবার বেদের মন্তরে বশ করা সাপের মত ফণা নামিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় সেই বউটি? কোথায় তার খোকোন্?......ভোরের সিঁদুরে আলোয় দেখ্‌লুম—ওই যেখানে বউ-ঝিরা গান গায়, ওখানে বালুর

চড়া আলো করে মেঘের মত কালো চুল এলিয়ে শুয়ে আছেন যেন মাদুগ্গা ; কোলের কাছে মায়ের আঁচল টেনে খেলা কর্চ্ছে সোনার কার্তিক। কাছে গিয়ে বুঝলুম—মায়ের পূজো শেষ ; আজ বিজয়া দশমী! কার্তিককে বুকে তুলে নিলুম, সোনার পিঁজরা পৃথিবীর মাটিতে ফেলে মাদুগ্গা তখন চলে গেছেন কৈলাস পর্ব্বতে।

বলতে বলতে আন্‌মনা হয়ে যায় শশী মাঝি ; দুহাত তুলে উদ্দেশ্যে প্রণাম করে কা'কে, শীর্ণ চোখের কোণে চক্‌চক্ করে দুফোঁটা জল। উৎসাহী শ্রোতার ডাকে শশীর চমক্ ভাঙ্গে :

—তার পর কী হল শশী ?

—আর কি হবে ?······সংক্ষেপে জবাব দেয় শশী :

—আলতা সিঁদূর পরিয়ে সোনার প্রতিমাকে চিতায় তুলে দেয়। চিতাভস্ম কুড়িয়ে রাখে গাঁয়ের বউঝিরা। সেদিন থেকে এ গাঙকে বলে সবাই বউডুবির খাল। কোলের খোকাকে বাঁচিয়ে স্বর্গে গেল সেই বউটি ; তারই গাওয়া ঘুম-পাড়ানী গান গেয়ে মঙ্গল কামনা করে সব এয়োরা তাদের কচি খোকাদের।

প্রলয়ঙ্কর দারুণ তুফানে কেমন করে বউটি বাঁচিয়েছিল তার খোকাকে ? কোন্ দৈবী শক্তি এসে রক্ষা করল পাহাড় প্রমাণ ঢেউএর গ্রাস থেকে ওই নধর শিশুকে—শশী তা বলতে পারে না। খোকাটিকে সে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিল তার অসুস্থ বাপের কাছে। সে খোকা আজ কত বড় হয়েছে, দেখতে কেমন হয়েছে, কোন্ দূর দেশে রয়েছে—কে জানে ?

॥ দুই ॥

সামনে খোলা ম্যাপ নিয়ে বসে আছে দীপঙ্কর। ছোট বোন অনুকে পেন্‌সিলের ডগা দিয়ে দেখিয়ে দেয় মেডিটারেনিয়ান, প্যাসিফিক্ ওশান্, আফ্রিকান্ ডেজার্ট্‌স্, মাউণ্ট এভারেষ্ট, আলপস্, পৃথিবীর আরো কত বিস্ময়কর দ্রষ্টব্য স্থান। কত দূর দেশ দেখতে সে চলে যাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। মাথার ঝাকড়া চুল সরিয়ে দাদার গা ঘেঁসে দাঁড়ায় অনু। বড় বড় চোখ দুটি পাকিয়ে অবাক হয়ে দাদার মুখের পানে তাকায়। এত দূর দেশে চলে যাবে তার দাদা! বার বছরের দীপঙ্কর আজ সাত বছরের অনুরাধার কাছে যেন দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শার মত বিস্ময়ের বস্তু হয়ে ওঠে। খুব কাকুতি করে বলে ঃ

—আমাকেও সঙ্গে নিবি তো দাদা?

মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে অবজ্ঞার হাসি হেসে ওঠে দীপঙ্কর। ওঃ, এখান থেকে দীনু পালের ফুলুরীর দোকানে যেতে হিম্মতে কুলোয় না—উনি যাবেন পৃথিবী ভ্রমণে!

তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে অনুরাধা ঃ

—তুই তো এখুনি যাচ্ছিস্ না, বড় হয়ে যাবি। তখন তো আমিও বড় হব। গায়ে জোরও হবে। লক্ষ্মী দাদাভাই, আমায় নিয়ে যাবি তো?

একটু ভেবে এইবার দীপঙ্কর সম্মতি দেয়।—যাবি? আচ্ছা, আমায় চিঠি দিস্।

বিস্মিত অনুরাধা জিজ্ঞাসা করে—চিঠি!

—বাঃ রে, কোথাকার হাবা মেয়ে! বড় হলেই তো মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। তখন তো তুই পরের বাড়ী থাকবি!

তাই তো! অনুরাধা তো এতটা তলিয়ে দেখেনি! পরের বাড়ী থেকে তবে দাদাকে চিঠিই লিখতে হবে। কিন্তু ডাক টিকেট্? হঠাৎ কি কথা মনে পড়ে গেল। ছুটে গিয়ে আলমারি থেকে একখানা মস্ত বড় খাতা বার করে এনে দাদার সামনে খুলে দিল। দেখ্ দাদা, কতো ডাক টিকেট জমিয়ে রেখেছি। এইগুলো এঁটে তোকে চিঠি দেব। অ্যাঁ?

খাতাটায় এক ধাক্কা মেরে দীপঙ্কর বলল, তুই একটা গবেট্ নাম্বার ওয়ান্। এ তো সব পুরোনো ডাক টিকেট। ওতে চিঠি যায় কখনো?

—তবে নতুন টিকেট কিনব?

—নতুন টিকেট কিনবি? টাকা পাবি কোথায়? ধর, তোর যদি হাড়কেপ্পনের সঙ্গে বিয়ে হয়! তারা যদি টাকা না দেয়! তখন?

একটু ভেবে অনুরাধা জবাব দিল—তখন তুই টাকা দিবি।

—আমার বয়ে গেছে। তখন তো তুই পর হয়ে যাবি!

কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে অনুরাধা সুধায়—আমি পর হব?

—তা বৈকি! বিয়ে দেওয়া মানেই মেয়েদের পর করে বাড়ী থেকে দূর করে দেওয়া!

উদ্গত অশ্রু আর বাঁধ মানল না। ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ল দুই গাল বেয়ে। ঝড়ের মত সে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

—এই অনু শোন্, শোন্! বাব্বা! চোখ তো নয়, যেন টালার ওয়াটার্ ট্যাঙ্ক! ম্যাপখানি গুটিয়ে রেখে দীপঙ্করও ঘর ছেড়ে বেরুল।

॥ তিন ॥

জমিদার বাড়ীর কাছারি ঘর। বহু প্রাচীন জমিদার বংশ। এককালে লাঠির জোরে মাটি দখল করেছিলেন। খাজনা আদায় না হলে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে নায়েবকে হাঁক দিয়ে বলতেন—"লাল ঘোড়া ছুটিয়ে দাও"—আর সেই হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই রাতের কালো আকাশকে রক্তাক্ত করে লক্ষ লক্ষ দুরন্ত শিখা গর্জে উঠ্‌ত—অবোলা জীবগুলির একটানা চাপা কান্না চৌচির হয়ে ফেটে পড়ত নিঃসীম দিগন্ত রেখায়···হুকুম দিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ তুলে যে দিকে মিলিয়ে যায় জমিদারের ছায়ামূর্তি···সেই আবছা আলো ঘেরা বনান্ত সীমায়। ঘরপোড়া মানুষগুলির কান্না এ বাড়ীতে পৌঁছতে পারে না! জলসাঘরে ততক্ষণ বেজে ওঠে লক্ষ্ণৌএর সারেঙ্গীর তার-যন্ত্রগুলি ঝঙ্কার তুলে, চটুল কটাক্ষ হেনে লীলায়িত ভঙ্গীতে নাচে রতনবাঈ, রুমাবাঈ···ছল্‌কে ওঠে রঙীন পানপাত্রে ফেণোচ্ছল দ্রাক্ষা-সব···ঠিক রক্তের মত রাঙা। লালঘোড়া ছোটে জমিদারের শিরায় শিরায়।

সে এককালের কথা। চৌধুরী বংশের সেই সব কীর্ত্তিমান পুরুষেরা আজ আশ্রয় নিয়েছেন দেওয়ালের গায়ে; মোটা ফ্রেমে বাঁধানো··· যায়গায় যায়গায় রঙ চটে যাওয়া তৈল চিত্রে। ছবিগুলির নীচেই মস্ত বড় ফরাস পাতা। ফরাসের এক পাশে বসে দাবা খেলছেন জমিদার শ্রীপতি চৌধুরী আর দেওয়ান গোলোক ভট্টাচার্য। ঝাড় লণ্ঠনটা মাঝে মাঝে হাওয়ায় দুল্‌ছে। কেঁপে ওঠা আলো আঁধারিতে দেওয়ালের তৈলচিত্রগুলির ফ্রেমের ভেতর থেকে যেন প্রেতাত্মারা থেকে থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

শ্রীপতি চৌধুরী, গোলোক ভট্টাচার্য। জমিদার আর দেওয়ান, এর চেয়ে বড় আর একটি সম্পর্ক···তাঁরা উভয়ে বাল্যবন্ধু, সহপাঠী। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসেও বাল্য-সৌহার্দ বিস্মৃত হননি এঁরা কেউ। ···খেলায় আজ মন বসছিল না দেওয়ানজীর, শ্রীপতি তা লক্ষ্য করে মৃদু হাসলেন। দীপু আর অনুরাধা! ওদের হয়তো ঘুম পেয়েছে। ওদের দুটিকে দুপাশে নিয়ে ঘুম পাড়ান গোলোক ভট্টাচার্য। জমিদার গৃহিণী মেয়েটিকে আঁতুড়ে রেখে স্বর্গারোহণ করেন। সেই থেকে মেয়েটিকে বুকে তুলে নিয়েছেন গোলোক। মুখে বলেন—আমার যেন ভরত রাজার অবস্থা হয়েছে, হরিণশিশুর মায়ায় বাঁধা পড়েছি।

কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনু। কোঁকড়ানো চুলগুলি সযত্নে মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে গোলোক আশ্চর্য হয়ে যান ঃ

'চখে জল কেন মা জননী! কি হয়েছে! দাদা বকেছে নিশ্চয়?'

—না কাকাবাবু, আমি কিছু বলিনি।—এগিয়ে আসে দীপঙ্কর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে।

কাকাবাবুর কোলে বসে দুর্গেশ্বরীর মত বীর দর্পে এইবার হাঁক ছেড়ে বলে অনুরাধা ঃ

না, বলনি?···আমি পর, আমায় বাড়ী থেকে দূর করে দেবে···বলনি বুঝি!

চম্‌কে ওঠেন গোলোক ভট্টাচার্য! অনুরাধা পর! তাকে চৌধুরী বাড়ী থেকে দূর করে দেবে দীপঙ্কর! দীপু বলে—

—বিয়ে হলে তোকে পরের বাড়ী যেতে হবে না?

—কখ্‌খনো যাবো না। এখানেই থাকব আমি।

ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সুরে বলে দীপু ঃ

—থাকিস্। তোর বরকে বলবে সবাই ঘরজামাই। বলুকগে, আমার

কি ? আমি তো দেখতে আসব না। আমি তখন বাড়ী ছেড়ে চলে যাব অনেক দূরে।

এইবার চমকে উঠলেন জমিদার শ্রীপতি চৌধুরী। দীপঙ্কর বলে, সে এই চৌধুরী বাড়ীতে থাকবে না! এবাড়ী সে ত্যাগ করে যাবে! চৌধুরী মশাইএর গলার আওয়াজ হঠাৎ ভারী হয়ে এল।

—দীপঙ্কর !

—বাবা !···

দীপঙ্করের কাঁধে সস্নেহে একখানি হাত রেখে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—তুমি তখন কোথায় থাকবে বাবা ?

গম্ভীরভাবে দীপঙ্কর জবাব দেয় ঃ

—সে অনেক দূরে—গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করব। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে বেরুবে—"ভূপর্যটক শ্রীদীপঙ্কর চৌধুরীর অত্যাশ্চর্য কীর্তি! সাইকেল যোগে সাউথ আফ্রিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, সোমালিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বিপদসঙ্কুল ভ্রমণ! এবং অত্যাশ্চর্য লজ্জার কাহিনী—তাহারি ভগ্নী শ্রীমতি অনুরাধা চৌধুরীর ঘরজামাই বিবাহ করিয়া রতনপুরে থাকন্‌ এবং বীরাঙ্গণার সকল কর্তব্য অবহেলা করিয়া পুঁইশাক ও উচ্ছে চচ্চড়ী রাঁধন্‌!"

অনুরাধার ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ দুই প্রৌঢ়ের প্রাণ খোলা উচ্চহাসির মধ্যে তলিয়ে গেল।

এত কলহের পর, রাত্রি ভোর হতে না হতেই সন্ধি স্থাপিত হল। সন্ধির সর্ত অনুসারে দীপু অনুকে নিয়ে চুপি চুপি রওনা হল চিতলমারীর বিলে। অনেক পদ্মফুল ফুটে আছে সেখানে। পাঁকের ভেতর নেমে পদ্মের নাল তুলে চিবিয়ে খেতে কী যে ভালো লাগে! তেষ্টা মরে···আর ভারী মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ। সাপের ভয় আছে

কিন্তু! তা থাকগে—তা বলে অমন নরম আর মিষ্টি পদ্মের নাল! স্তূপাকার নাল ভেঙ্গে খেয়ে আর পদ্মফুল নিয়ে তারা যখন বাড়ীর খিড়কির পথে ফিরে এলো—বাড়ীর পুরোনো ঝি রতুর মায়ের তো চক্ষু স্থির! আপাদ-মস্তক পাঁক মেখে দু' ভাইবোনের একি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি! ঝি আঁৎকে উঠতে দীপঙ্কর অবস্থাটা বুঝতে পারল। আঙুল দিয়ে মাটিতে নিজেদের ছায়া দেখিয়ে দিল এবং দৃঢ়তার সঙ্গে রতুর মাকে বুঝিয়ে দিল যে তাদের দেখে আশঙ্কার হেতু মাত্র নাই, তাদের শরীরের ছায়াই তার প্রমাণ।

রতুর মা আশ্বস্ত হল বটে। তবু প্রতিবাদ করে বলল :

—তোমার এসব মতিগতি ভাল নয় দাদাবাবু, নিজে রাত-দিন বন-বাদাড়ে ফিরছ, দিদিমণিকে পর্যন্ত তুমি গেছো মেয়ে করে তুলছ! মেয়েটাকে কি কুশিক্ষাই না তুমি দিচ্ছ! আর হবেই না বা কেন? নিজের জন হলে তবু কথা ছিল। হাজার হলেও দিদিমণি তো তোমার—

—রতুর মা! ঝিএর কথা শেষ না হতেই হাঁক দিলেন চৌধুরী মশাই। চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বাড়ীর ভেতরে আসবার পথে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন ঝিএর কথা। দীপু ও অনুকে ইসারা করলেন বাড়ীর ভেতরে যেতে। তারা চলে গেলে ঝিকে বললেন :

—আমি সব শুনেছি রতুর মা। অনেক কাল এ বাড়ীতে রয়েছিস, রতনপুরের জমিদার বাড়ীর রীতি-নীতি তোর না জানবার কথা নয়। তোকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আজ তুই যে কথা বলছিলি—ফের যদি কোন দিন শুনি···পাইক দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে চিতলমারী বিলের জলে পুঁতে ফেলব। মনে থাকে যেন।—

খড়মে জোর আওয়াজ তুলে চৌধুরী চলে গেলেন। রতুর মা কাঠ হয়ে সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

॥ চার ॥

পড়ন্ত বেলা। সূর্য ডুবু ডুবু। বউডুবির খালে নাও বেয়ে চলেছে বিশ বাইশ বছরের জোয়ান দেবনাথ। নৌকায় বসে আনমনে তামাক টানছে কুসুমদিঘির বাগ্দীমোড়ল পেহ্লাদ মাঝি। মাথার সবচুল কাশফুলের মত শাদা হয়ে গেছে, তবু পেশীবহুল দেহটির পানে তাকিয়ে চমকে উঠ্তে হয়, বুঝি বা ইস্পাতে গড়া মূর্তি! আজও পেহ্লাদ বাগ্দী লাঠি ধরে দশ বিশ গাঁয়ের জোয়ানকে নাকি কাহিল করে দিতে পারে। এ চত্তরের চাষী, তাঁতী সবাই মোড়ল বলে মানে পেহ্লাদকে। চক্-ইস্মাইলপুরের চাষীদের মধ্যে জমি জমা নিয়ে কি গণ্ডগোল বেঁধেছে, তারই নিষ্পত্তির জন্য ডাক পড়েছে মোড়লের। সাকরেদ্ দেবনাথ ছায়ার মত সঙ্গে ফেরে ওস্তাদের।

শীতান্তের নদী। জল এখন অনেকটা শান্ত। সূর্যাস্তের গলে-পড়া সোনা যেন তন্বীবধূটিকে সোনালী জরির কাজ করা চিক্‌মিকি ওড়না পরিয়েছে। বাঁশবনের পাতা কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আসে। কলসী ডুবিয়ে ঘরে ফেরবার পথে গাঁয়ের বৌটির ঘোমটা উড়ে যায়। আড় চোখে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে বাঁ-হাতে ঘোমটা টেনে, ডান কাঁখের কলসীতে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলে নয়া-বৌ ঘরে ফিরে যায়। নাও বাইতে বাইতে দেবনাথ আচম্‌কা গান ধরে। বড় করুণ ভাটীয়াল। কোন্ সে সোনার মেয়ে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে ভাটীর দেশে মনপবনের নায়ে! তার খোঁপায় ছিল নলটুঙ্গি ফুল, চৈতালি হাওয়ায় তার কানের ঝুমকো ফুল দুটি দুলে উঠ্তো। আজও নাকি শূন্য বালুর চরে তার পায়ের নূপুর থেকে থেকে রুমঝুম্ করে বেজে ওঠে! সেই হারিয়ে যাওয়া

সোনা মেয়েটি শুধু নিজেই ভেসে যায়নি, দেবনাথকে ভাসিয়ে গেছে। তার শোকে শঙ্খনদী আজও কাঁদে, সঙ্গে কাঁদে বনের পঙ্খিনী।

—"রতনপুরের বজরা মনে হচ্ছে না রে দেবা?"—পেহ্লাদের কথা শুনে গান থামিয়ে তাকিয়ে দেখে দেবনাথ। তাই তো! ময়ূরপঙ্খী নায়ের মত পাঁচ পাল তোলা বাহারী ছবি আঁকা অতবড় বজরা আর কার আছে এ তল্লাটে! তাড়াতাড়ি দাঁড় টেনে এগিয়ে যায় দেবনাথ বজরার কাছাকাছি। সম্ভ্রমের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে—

—বজরায় কোন্ হুজুর মাঝি ভাই?

—দেওয়ানজি হুজুর, মহাল দেখতে বেরিয়েছেন। গলা খাটো করে জবাব দেয় বজরার মাঝি।

—কার সঙ্গে কথা বলছ মাঝি? বজরার ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করেন গোলোক ভট্চায।

—আজ্ঞে হুজুর, কুসুমদিঘির বাগ্দীমোড়ল।

—কে! পেহ্লাদ? ভাল আছিস্ রে? জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন দেওয়ানজি।

—এজ্ঞে হুজুর, ছিরিচরণ আশীব্বাদে।

পেহ্লাদ আর দেবনাথ দু'জনেই তাদের নৌকো থেকে দু'হাত জুড়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাল দেওয়ানজিকে। তারা রতনপুরের প্রজা নয়; কিন্তু দেবতার মত মান্য করে দেওয়ানজিকে। প্রতি বছর রাস উৎসব দেখতে যায় রতনপুরের জমিদার বাড়ীতে। কৌতূহলী দুটি কিশোর মুখ দেওয়ানজির পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছিল। নজরে পড়তে একগাল হেসে বলে উঠল পেহ্লাদ—

—এই যে, আমাদের দাদাবাবু, দিদিমণিও সঙ্গে এসেছেন দেখছি! পেন্নাম হই আপনাদের!

—বউডুবির খালের এদিকটায় ওরা কখনো আসেনি ; বাড়ীতে সারা দিন দুষ্টুমি করে বেড়ায়। তাই ভাবলুম, সঙ্গে নিয়ে চলি।
—তা বেশ করেছেন হুজুর। এ গাঙ দেখলে পুণ্যি হয়। ওঁদের সেই ঘাটটাও একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।
—হ্যাঁ, এসেছি যখন, সে তো দেখবেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেন খানিকটা আপন মনেই জবাব দেন দেওয়ানজি।

বাঁ-দিকের ওই বাঁকটা ঘুরেই পেহ্লাদদের নৌকো ছোট খালে পড়বে। চক্-ইস্‌মাইলপুরের ওই নৌকো-পথ। পেহ্লাদ আবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করল, প্রণাম করল দেবনাথ। দেওয়ানজির সেদিকে লক্ষ্য নেই। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শূন্য আকাশের পানে। টুকরো টুকরো হাল্কা মেঘ ভেসে যায়, দু'চারটে বক ডানা মেলে মিলিয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে। দেওয়ানজি তাকিয়ে থাকেন।

—বউডুবির খাল! বড় অদ্ভুত নাম তো! দেওয়ানজির চমক ভাঙ্গে দীপুর জিজ্ঞাসায়।—আচ্ছা কাকাবাবু, এ খালের নাম বউডুবির খাল কেন হল? দেওয়ানজি একটু চুপ করে থাকেন। একটু কেসে বোধহয় গলাটাকে একটু পরিষ্কার করে নেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন :
বার বছর আগে একটি বউ এই খালে নৌকোয় যাচ্ছিল। ঝড় উঠে নৌকো ডুবি হল। বউটি তার কোলের খোকাটিকে বাঁচিয়ে নিজে ডুবে গেল।
বউটি মরে গেল?—জিজ্ঞাসা করে দীপু।
—না, কোলের খোকাকে বাঁচিয়ে দেবীপ্রতিমার মত যে ডুবে যায় সে তো মরে না! সে যে দেবী।...একটু থেমে অস্ফুট কণ্ঠে বলেন :

—হয় তো এই জলের নীচে সে ঘুমিয়ে আছে! বৃদ্ধ গোলোকনাথের গলার স্বর কেঁপে উঠে থেমে গেল।

তখন রাত্রি প্রায় নেমে এসেছে, সেই ঈষৎ অন্ধকারেও মনে হল বৃদ্ধের চোখের কোণে কি যেন চক্‌চক্ করছে! দীপু আর অনুকে সহসা বুকের কাছে টেনে নিয়ে তাদের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগলেন। কিন্তু তবু তো মনের ঝড় থামে না!

বারো বছর আগেকার সেই ঝড়ের রাত্রি। হিজল দিঘির কাছারী বাড়ীতে কঠিন রোগ যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছেন গোলোকনাথ! রোগ যাতনার চেয়ে আরও বেশী উৎকন্ঠিত হয়ে পড়েছেন তিনি—শিবানী আর তাঁর খোকনের চিন্তায়। তাঁর অসুখের খবর দিয়ে দেশে চিঠি লেখা হয়েছে শিবানীকে। শিবানী নিশ্চয়ই খোকনকে কোলে নিয়ে রওনা হয়ে পড়েছে। এই ঝড়ের মাঝখানে দুরন্ত নদী পার হচ্ছে, হয়তো একখানি ছোট্ট ছইএ ঢাকা ডিঙ্গি নৌকা করে। হে ভগবান, তাদের নিরাপদে পৌঁছে দেবে তো?

বাতাস হা হা করে হেসে ওঠে, পাগলা নদী দক্ষিণা কালিকার মত কালো চুল এলিয়ে নেচে ওঠে। জল, স্থল একাকার করা সেই নিকষ কালো অন্ধকার চিরে শানিত খড়্গের মত এক সময় বাজ নেমে আসে —তারপর সব যেন মৃত্যুর মত স্তব্ধ···অন্তহীন। সে এক বিচিত্র অনুভূতি! তবে কি তাঁর মৃত্যু হয়েছিল? আজ কি তাঁর পুনর্জন্ম? না, কাল রাত্রে তিনি মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন, ভোরের আলোয় চোখ চেয়ে দেখলেন তিনি বেঁচে আছেন, তাঁর দু'মাসের খোকাও বেঁচে আছে। কিন্তু শিবানী?···গাঁয়ের মেয়েরা চিতাভস্ম কুড়িয়ে নিয়ে একে একে চলে গেল। দিন গেল; আবার সন্ধ্যা নেমে এল। একা সেই

নদীর ঘাটে গোলোকনাথ, কোলে তাঁর খোকোনমণি। সারা দিন মায়ের বুকের দুধ পায়নি; হাত-পা ছুঁড়ে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে!

"বন্ধু—"

ডাক শুনে মুখ তুলে তাকালেন গোলোকনাথ। অশ্বত্থের ডালের ফাঁকে যেটুকু ভাঙ্গা চাঁদের আলো পড়েছিল—তাতেই চিনলেন আগন্তুককে! রতনপুরের জমিদার শ্রীপতি চৌধুরী, তাঁর বাল্য বন্ধু!

—খবর পেয়ে তোমায় নিতে এসেছি বন্ধু! আমার সন্তান নেই। তোমার খোকন আজ হতে আমার ছেলে। রতনপুরের অন্ধকার চৌধুরী বাড়ীতে ঐ জ্বালাবে দীপের শিখা; ও হবে দীপঙ্কর— আমাদের দীপু। শ্রীপতি চৌধুরী পরম আগ্রহে খোকনকে বুকে তুলে নিলেন। শ্রীপতি চৌধুরীর সঙ্গে নিঃশব্দ ছায়ামূর্তির মত গোলোকনাথও চলে এলেন রতনপুরে। হ্যাঁ, সে আজ বারো বছর আগের কথা। সেই হতে দীপুকে সবাই জানে শ্রীপতি চৌধুরীর ছেলে। আর অনুরাধা? সে তো জন্মেছে অনেক পরে! মাত্র সাত বছর হল!...ওরা দুটি ভাইবোন, ওদের ভাল হোক, ওদের কল্যাণ হোক! দু'জনের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলাতে থাকেন গোলোকনাথ।

রাত্রে বজরায় শুয়ে উস্‌খুস্‌ কর্চ্ছে দীপু। পাশটিতে অনু ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। দীপুর চোখে ঘুম আসে না। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন গোলোকনাথ,—অমন কর্চ্ছ কেন দীপু? অসুখ করেনি তো? দীপু ঘাড় নেড়ে বলে—না। তবু গোলোকনাথ তার কপালে হাত রাখেন। নাঃ, জ্বর হয়নি তো!—রাত অনেক হয়েছে; নড়াচড়া কোরো না, চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়। দীপু চোখ বোজে। চোখ বুজে ভাবে সেই বউটির কথা। এই ঘাটেই নাকি সে দেবীপ্রতিমার

মত ডুবে গিয়েছিল! সে মরেনি! জলের নীচে ঘুমিয়ে আছে! আচ্ছা, জলের ভেতর নেমে গেলে কেমন হয়? তাঁকে খুঁজে আনা যায় না! কতো রূপকথার গল্প শুনেছে, জলের নীচে বরুণ রাজার দেশের কথা, প্রবালপুরীর সাগরিকার কথা! সাগরিকার দেশে গিয়ে সে কি একবার দেখে আসবে সেই বউটিকে যে তার খোকনকে বাঁচিয়ে নিজে ডুবে গেল! ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় দীপু ঘুমিয়ে পড়ল।

…নিশুতি রাত। খাতাপত্র দেখা শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছেন গোলোকনাথ, পাশে তাঁর গলা ধরে ঘুমুচ্ছে দুটি ভাইবোন। বজরার খোলা জানালা দিয়ে বেলে-জ্যোৎস্না এসে লুটিয়ে পড়েছে তাদের ঘুমন্ত চোখে মুখে। মাঝিমাল্লা কেউ জেগে নেই। চারদিক নিঝুম। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ঐক্যতান মাঝে মাঝে কেটে যায় দূর গাঁয়ের কুকুরের বিলম্বিত ডাকে। দীপু স্বপ্ন দেখে…চিতলমারীর বিলে মেলা বসেছে। দুর্গা পূজার ভাসানের মেলা। চৌধুরী বাড়ীর চালচিত্তির দেওয়া প্রকাণ্ড প্রতিমাখানা আরতির ধূপের ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। প্রতিমা ঘামছে। ঠোঁটে, নাকের ডগায়, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মা দুর্গার মুখের হাসিটি কী মিষ্টি আর কী করুণ! দীপুর পানে তাকিয়ে মা দুর্গা যেন বলছেন—'মাত্র তিনদিন থেকেই তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে কর্চ্ছে না।' দীপুও বলতে চায়—তোমাকেও যেতে দেব না মা দুর্গা। বলতে অনেক চেষ্টা করে; কিন্তু কিছুতেই মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। একি! এত চেষ্টা করেও মুখে কথা ফুটছে না কেন তার? অস্ফুট গোঙানীর মত আওয়াজ হয়। বাবাকে বলতে চায়, কাকাবাবুকে বলতে চায়—ওগো, তোমরা মা দুগ্‌গাকে ডুবিয়ে

দিও না। তার অস্ফুট আর্ত কাকুতি কোথায় তলিয়ে যায় বিশ পঁচিশটা ঢাকের বাজনায়। প্রতিমা বিসর্জন হয়ে যায়।

ধড়মড় করে উঠে বসে দীপু। একি অদ্ভুত স্বপ্ন! না, সামনের পূজোয় সে কিছুতেই মা দুর্গাকে জলে ডুবিয়ে দিতে দেবে না! জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। ওকি! খালের জলের ভেঁতর থেকে আস্তে আস্তে কে উঠে আসছে! মা দুর্গা! হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু এ কি রকম ধারা! দেহটি যেন স্বচ্ছ কাঁচের মত, ভেতর থেকে নদীর জল, ওপারের গাছপালার ছায়া সব ফুটে উঠছে! জমাট কুয়াসা? না, চাঁদের আলো জড়ো করে গড়ে উঠেছে ঐ মূর্তি! দীপু ভাল করে দুহাতে চোখ রগড়ে নিল। নাঃ, চোখের ভুল নয়! মূর্তিটি নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল বজরার দিকে।···দীপু ভাবে, মা দুর্গা হলে তাঁর দশখানা হাত গেল কোথায়? হাতে হীরা মুক্তার কাঁকণ, চুড়ি নেই তো! শুধু দুগাছা শাঁখার রুলি। পরণে লাল পাড় দিশি শাড়ী। মাথায় মুকুট নেই, কিন্তু কপালের সিঁদূরের টিপটি ঠিক তেমনি জ্বল জ্বল কর্চ্ছে। কপালে, নাকের ডগায় ঐ তো তেমনি ঘাম হচ্ছে, সেই আরতির সময়কার ধূপের ধোঁয়ার ঘাম। মুখে তেমনি মিষ্টি হাসি, তেমনি ম্লান হাসি। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় দীপু এ হাসি দেখেছে···দশমীর পর শূন্য নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে মায়ের বেদীর দিকে তাকিয়ে ওই হাসির কথা মনে পড়েছে; বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। না থাক দশখানা হাত, না থাক হীরের মুকুট··· দীপুর বুঝতে এতটুকু ভুল হ'ল না যে ইনিই মাদুর্গা। বজরার জানালার একবারে কাছাকাছি চলে এসেছে সেই স্বচ্ছ মূর্তি। স্থির দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন দীপুর দিকে। ও চোখের পানে তাকিয়ে দীপু আর চোখ ফেরাতে পারে না। চোখের দৃষ্টিতে ব্যথা, না আনন্দ

…কী উপ্‌ছে পড়ছে…দীপু বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কখন এক সময় দীপুর মনে হল তাকে যেন হাত ইসারা কর্চ্ছেন…তাকে ডাকছেন! দীপু মন্ত্রমুগ্ধের মত বেরিয়ে গেল বজরা থেকে…অনুসরণ করল সেই স্বচ্ছ সঞ্চরমান মূর্তিটিকে। একটু পরে ঝুপ করে আওয়াজ হ'ল নদীর জলে। জেগে ওঠে বালিকা অনুরাধা! একি, দাদা পাশে নেই কেন! শঙ্কিত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাকে—দাদা! দাদা-গো!—জেগে ওঠেন গোলোকনাথ! কী হ'ল অনু?—কাঁদো কাঁদো হয়ে জবাব দেয় অনু—দাদা!
তাইতো! কোথায় গেল দীপু! দীপু…দীপু! বাইরে ছুটে এসে মাঝি মাল্লাদের ডেকে তোলেন।…ওরে ওঠ্‌, সর্বনাশ হল বুঝি—জলে ঝাপ দে…দীপুকে খুঁজে আন্‌।—সাত আট জোয়ান ঝাঁপ দিল জলে, খালের জল তোলপাড় করে তোলে তারা। চীৎকার করে ডাকে—দাদাবাবু…দাদাবাবু গো।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে দীপুকে খুঁজে পাওয়া গেল। যেখানটায় হিজল গাছের ছোট ছোট লালরঙের অজস্র ফুল ঝরে পড়েছে—খালের ধারের মখমলের মত নরম মাটিতে মনে হল কে যেন বড় যত্নে ফুলের বিছানায় তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে! গোলোকনাথ পাগলের মত ছুটে আসেন, চোখে জলের ঝাপটা দেন। মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে ডাকেন—দীপু, দীপঙ্কর! দীপু চোখ মেলে তাকায়। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে কাকে যেন খোঁজে। কিন্তু সে তো নেই! এত যত্নে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে অশরীরিণী মিলিয়ে গেল কি আলো-আঁধারি ঘোমটা টানা এই বউ-ডুবির খালের জলে?

॥ পাঁচ ॥

রাসবিহারী এভেন্যুর মোড়ে মস্ত বড় বাড়ী। বাড়ীর সামনে নার্সারী স্কুলের গাড়ী দাঁড়িয়ে। দরোয়ান খবর দিয়ে গেল দিদিমণি আজ স্কুলে যাবে না। গাড়ী চলে গেল। কেমন করে আজ স্কুলে যাবে অনুরাধা? কাল ভাইফোঁটা। দীপুকে ফোঁটা দিতে হবে না? আজ যে তার কতো কাজ!

বউ-ডুবির খালের সেই রাত্রের ঘটনার আট দশ দিন বাদেই চৌধুরী মশাইএর সঙ্গে পরামর্শ করে গোলোকনাথ ওদের কলকাতায় নিয়ে এসেছেন। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। কি জানি, দেশে থাকলে যদি আবার ঐ খাল দীপুকে টেনে নেয়! কাজ নেই দেশে থেকে। তার চেয়ে কলকাতায় পড়াশুনো করুক। মাঝে মাঝে তিনি এসে থাকবেন; কখনও বা চৌধুরী মশাই।…

স্কুলের বেলা হয়ে গেছে, দীপু কলম খুঁজে পাচ্ছে না। বই খাতা কলম সবই তো একটু আগে গুছিয়ে রেখে খেতে গেল, তবে কলম কি হল! হাঁ, যা অনুমান করেছে তাই। দোতলার দালানের কোণে পা ছড়িয়ে বসে কোলের ওপর একখানা বাঁধানো খাতা নিয়ে অনুরাধা তারই কলম দিয়ে ও কি কর্চ্ছে!—এই বাঁদরী, কি হচ্ছে শুনি? —ভূরু কুঁচকে জবাব দেয় অনু, বাঃ রে, কাল ভাইফোঁটা, ফর্দ করতে হবে না?—হাত থেকে ছোঁ মেরে কলমটি কেড়ে নিয়ে দীপু বললে, —ভাইফোঁটার ফর্দ না তোর মুণ্ডু! কৌতূহলী হয়ে খাতার পানে তাকিয়ে বলল,—এটা আবার কি এঁকেছিস্? কি জন্তুরে? মানুষ না ভূত?।

—দূর, ভূত হতে যাবে কেন? প্রতিবাদ করে বলে অনুরাধা:

—তোর ছবি এঁকেছি। কেমন, ভাল হয়নি ? খাতাখানা তুলে ধরে দীপুর সামনে।

—ইয়ারকি মারবার জায়গা পাওনি ? এক চাঁটি বসিয়ে দিল অনুর মাথায় ; তর্‌তর্‌ করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

…অনু খাতা ছুঁড়ে ফেলে গোমড়া মুখে উঠে গেল।…দেব না ভাইফোঁটা। আমি খাব মার্‌ আর উনি খাবেন মেঠাই ! বয়ে গেছে আমার।

শেষ পর্যন্ত গোলোকনাথের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষে একটা রফা হয়ে গেল। তার জন্য নিউমার্কেট থেকে ডল্‌পুতুল, রঙীন বেলুন, চকোলেটের বাক্স প্রভৃতি অনেক মুল্যবান বস্তু ভেট দিতে হয়েছিল মানিনী অনুরাধাকে।

পরদিন ফোঁটা দিয়ে নিজের লালায়িত রসনাকে অনেক করে সংযত রেখে গাছকোমড় বাঁধা অনুরাধা খাবারের থালাটি দীপুর সামনে এগিয়ে দিতেই দীপু প্রতিবাদ করে গম্ভীরভাবে বলল, কই, আগে পেন্নাম কর্‌ !

একটু দমে গিয়ে অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল—তোকে পেন্নাম করতে হবে ?

দীপু তেমনি ভারিক্কি চালে মাথা নেড়ে বলল—হাঁ, গুরুজনকে পেন্নাম করতে হয়।

অগত্যা নিরুপায় অনুরাধা টিপ করে একটি প্রণাম জানাল তার এই গুরুগম্ভীর গুরুজনটিকে।

॥ ছয় ॥

দশ বছর পর আর এক ভাইফোঁটার দিনে রাসবিহারী এভিন্যুর সেই ঘরটিতেই এক তন্বী তরুণী প্রণাম করছে তার দাদাকে। দাদা পা সরিয়ে নিয়ে বলল—থাক্, থাক্ প্রণাম করতে হবে না! তরুণী ডান হাত বাড়িয়ে পায়ের ধূলো নিতে নিতে হঠাৎ হেসে ফেলল।

—হাস্ছিস্ কেন?

প্রশ্নের উত্তরে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে দাদার পানে তাকিয়ে তরুণী বলল—আজ পা সরিয়ে নিচ্ছ। একদিন কিন্তু তুমি আমার গুরুজন এই অধিকারের বলে জবরদস্তি করে প্রণাম আদায় করেছিলে। মনে নেই?

পুরোনো দিনের কথা মনে করে দু'জনেই সশব্দে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল।

—একটা কথা মনে পড়ল অনু।

অনুরাধা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। দীপু বলল—সামনের বছর তোর হাতের ফোঁটাও পাব না, মিষ্টিও পাব না। ভাবতে মনটা কেমন হয়ে গেল। একটু চুপ করে থাকে দীপঙ্কর।

অনুরাধা বলে—সে আমিও ভেবেছি। খামের ভেতর পূরে পদ্ম-পাতার ওপর চন্দনের টিপ আর রসোগোল্লার প্যাকেট বিলেতে পাঠিয়ে দেব।

—দি আইডিয়া! উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে দীপু।—বিলেতে বসেও ভাইফোঁটা পাব তাহলে! খুব ট্যাক্‌ট্‌ফুলি ম্যানেজ করেছিস্ তো! আমি ওখানে বসে ভাইফোঁটার মিষ্টি খাব; আর তুই এখানে বসে শাঁক বাজাবি!

হঠাৎ চমকে ওঠে অনুরাধা, ঐ যাঃ, শাঁক বাজাতেই ভুলে গেছি যে! তাড়াতাড়ি উঠে শাঁকে ফুঁ দিল অনুরাধা।

...ঠিক অমনি শাঁকের আওয়াজ! হাঁ, অনেকগুলি শাঁক এক সঙ্গে বেজে উঠ্‌লে যেমন হয় ঠিক তেমনি আওয়াজ করে বিলাতগামী জাহাজখানি যেদিন দীপঙ্করকে নিয়ে সমুদ্রের জলে পাড়ি জমাল—জেটির ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইল অনুরাধা। জাহাজ মিলিয়ে যায় দিগন্তের কোলে, কিম্বা ঝাপ্‌সা হয়ে আসে বিশ্বজগৎ অনুরাধার চোখের সামনে!

কোন্ খেয়ালী শিল্পী যেন নির্মমভাবে রবার দিয়ে মুছে দেয়—তার হাতে আঁকা ছবি।

তার উনিশ বছরের জীবন কেটেছে যার সঙ্গে, একটি দিনও যার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়নি, সেই দাদা আজ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কত দূর দূরান্তে! অনুরাধার সামনে আজ সব শূন্য ওই অন্তহীন সমুদ্রের মত। জীবনটাই যেন লবণাক্ত সমুদ্র।

দীপঙ্করের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে চার বছর বিলাত প্রবাসকালে চৌধুরী বাড়ীর ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। বিষয় নিয়ে নানা মামলা, মোকদ্দমা! দুশ্চিন্তায় চৌধুরী মশাইএর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। সে ভাঙ্গা শরীর মন আর জোড়া লাগল না। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনুরাধাকে কাছে ডেকে তার দাদার সম্বন্ধে ক'টি গোপনীয় কথা বললেন। তাঁর বলবার ইচ্ছা ছিল না, তবু হয়তো এ কাহিনী একদিন প্রকাশ পাবেই—তাই অনুরাধাকে বিশেষ করে আদেশ দিয়ে যান—তোমার দাদার সম্বন্ধে যা বলব জীবনে কখনো তা কারু কাছে প্রকাশ করো না। একটু থেমে, একটু দম নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন,—দীপু তোমার মায়ের পেটের ভাই নয়।

সে মুহূর্তে সেখানে বজ্রপাত হলেও বুঝি অতখানি ভয় পেয়ে অমন করে আর্তনাদ করে উঠত না অনু।

চৌধুরী মশাই বললেন,—শান্ত হও,—ভয় পেয়ো না, বিস্মিত হয়ো না; আমি যা বলছি—তা' সত্যি। তবে দীপু কে, কার সন্তান—এ সব কিছু জানতে চেয়ো না। আমি চলে গেলেও একজন আছেন, এর অতিরিক্ত কিছু বলবার প্রয়োজন হলে তিনিই বলবেন। জগৎ শুদ্ধ সবাই তাকে তোমার ভাই বলে জানে, আমিও সেই পরিচয়েই তাকে পালন করেছি! বড় ভাইএর যা প্রাপ্য তা' তুমি চিরকাল তাকে দেবে সে ভরসা আমার আছে অনু।

ক্লান্ত হয়ে পাশ ফিরে শুতে চেষ্টা করলেন চৌধুরী মশাই। অনুরাধা তাঁকে আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে মাথার নীচে বালিশটা টেনে দিল। বড্ড হাঁপিয়ে গেছেন। কথা বলতে কস্ট হয়। কিন্তু আজই না বলে উপায় নেই যে। বলবার সময় আর যদি না পান?—আস্তে আস্তে বলেন:

—আর একটি চিন্তা আমাকে কাঁটার মত খোঁচা দিচ্ছে মা। আমার প্রপিতামহের ইচ্ছা ছিল এই জমিদারী রাধামাধবের দেবত্র করে দেবেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। তবু আমরা মনে প্রাণে এ ষ্টেট্‌কে রাধামাধবের বলেই জানতুম।···নানা মামলা মোকদ্দমায় পড়ে শেখরডিহির রায় বাবুদের কাছে বহু টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েছি; তারা ডিক্রি করে বসে আছে। আমার মৃত্যুর পর হয়তো তারা রতনপুর গ্রাস করবে। ঋণের দায়ে রাধামাধবের সম্পত্তি আমি শেখরডিহির জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে গেলুম—এ চিন্তা যে মৃত্যুর পরও আমার আত্মাকে শান্তি দেবে না মা।

অনুরাধা আর্তকণ্ঠে বলল:

—কি হবে বাবা! আমি কি করতে পারি তুমি আমায় বলে যাও।

—কোন উপায় নেই মা, রাধামাধবকে আমি বঞ্চনা করে গেলুম।···
মুমূর্ষু পাণ্ডুর দুটি গাল বেয়ে জলের ধারা নামল,—বুকের পাঁজর হাঁপরের মত দ্রুত ওঠা নামা করতে লাগল।···অনুরাধার চোখেও নামল বাঁধভাঙ্গা জলের ধারা। বাবার পায়ে মুখ লুকিয়ে সে বলে উঠল :

—না, সে হবে না বাবা! আমি তোমায় কথা দিচ্ছি যেমন করে পারি রাধামাধবের সম্পত্তি আমি রাধামাধবকে ফিরিয়ে দেব। শেখরডিহির জমিদার চৌধুরীবাড়ীর গৃহদেবতার সম্পত্তির একটি কুটোগাছও ছুঁতে পারবে না। তার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তোমার মেয়ে অনুরাধা তা দেবে।

মুমূর্ষু চৌধুরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! একটা অপরিসীম স্বস্তির আভাস ফুটে উঠল চোখে মুখে। অনুরাধার মাথার ওপর তিনি একখানি হাত তুলে দিলেন। কী যেন বলতে গেলেন···ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।···

॥ সাত ॥

চার বছর পর বিলাত থেকে ফিরে এসে দীপঙ্কর যেন অকূল সমুদ্রে পড়ে গেল। জমিদারীর স্তূপাকার কাগজপত্র এসেছে। সব দেখে শুনে যা কিছু বিলি ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। মোটা মোটা খাতা-পত্তর কাগজের বাণ্ডিলের মাঝখানে সে যেন হাঁপিয়ে পড়ল।
দরজায় এসে অনুরাধা ডাকে—দাদা।

চমক ভেঙ্গে চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় দীপঙ্কর।—কোথাও বেরুচ্ছিস নাকি ?

পরশু আমার জন্মদিন—অনুরাধা বলে—নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি। যাবে আমার সঙ্গে ?

দীপঙ্কর আঙুল দিয়ে খাতাপত্তর দেখিয়ে বলে—এই পাহাড় পর্বত যে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারছি না বোন্।

ছেলেবেলার মত দুষ্টুমী-ভরা হাসি খেলে যায় অনুরাধার চোখে মুখে।

—বেশ হয়েছে। তুমি যখন বিলেতে ছিলে, কাকাবাবু আমাকেও বন্দী করেছিলেন—ঐ দলিলের পাহাড়ে। তুমি এসে পড়েছ, এবার আমার ছুটি।...এক পা এগিয়ে আবার পেছন ফিরে বলে ঃ

আমি যাচ্ছি, অনেক জায়গা ঘুরতে হবে। তুমি অমিতাদের ওখানে থেকো। ফিরতি পথে তোমায় তুলে নেব, কেমন ?

দীপঙ্কর ঘাড় কাৎ করে জানায় তাই হবে। বিলিতি সেণ্টের মৃদুগন্ধ ছড়িয়ে একঝলক খুশীর হাওয়ার মত অদৃশ্য হয়ে যায় অনুরাধা।

...কতো কাজ! শকুন্তলা রায় থাকে কাঁকুলিয়া রোডে, অনামিকা ঘোষ দস্তিদার পদ্মপুকুরে, শেলী বোস সেই রিজেণ্ট পার্কে, রুবি রায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে, কাকলি ব্যানার্জি আবার নর্থে—বোস-পাড়া লেনে। বাপস্! কতো ঘুরতে হবে! উপায় নেই। আজই নেমন্তন্ন পর্ব শেষ করা চাই। মাঝখানে তো মাত্র আর একটি দিন সময়। ড্রাইভারকে গাড়ীর গন্তব্য পথের নির্দেশ দিয়ে ব্যাগ থেকে ছোট্ট নোট বই খুলে মিলিয়ে দেখে অনুরাধা ভুলে কারু নাম বাদ পড়ে গেল কি না। এত বন্ধু বান্ধবী!

তা হবেই তো! দাদা বিলেত চলে যাবার পর দিনকতক বড় নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছিল। তাই ক্লাবে, মজলিসে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। সান্ধ্য বাসর মুখরিত হয়ে উঠেছে, গানে, গল্পে, গুঞ্জরণে, তরুণ তরুণীর অকারণ হাসির উচ্ছ্বাসে। তাছাড়া অনুরাধার পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচি, অত্যন্ত সরল অথচ আভিজাত্য-

পূর্ণ চাল-চলন, উনিশটি বসন্তের বিকশিত পুষ্পরুচি তনুদেহের এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল—যা চুম্বকের মত প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত্তটিতেই যেন অজ্ঞাতে কাছে টেনে নেয়।

বন্ধু বান্ধবীদের সবাইকে যে অনুরাধা পছন্দ করে তা নয়। যেমন ঐ শেলী বোস, ফিরিঙ্গী মেয়েদের মত ছোট করে চুল ছেটেছে, ঠোঁটে সব সময় লিপষ্টিক মাখা, কথা কয় খানিকটা বাঁকা করে। বেহায়াপনা দেখে এমন হাসি পায় অনুরাধার।

আর রুবিটা এমন ব্যাটাছেলে-ঘেঁষা, গায়ে পড়ে ছেলেদের সঙ্গে ও রকম নোংরামি, অনুর একটুও ভাল লাগে না। তবে মেয়েটার মন কিন্তু বেশ সরল। কথায় কথায় "শেম্" বলে, ক্ষুরের মত হাইহিল জুতো ঠুকে কবি পল্লব সেনকে এমন নাস্তানাবুদ করে···দেখে অনুরাধার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়!

বন্ধু, বান্ধবীরা সবাই অনুরাধার অনুরাগী। তবু অনুরাধা কার সঙ্গে দুটো কথা বেশী বলেছে, কাকে দেখে মুচকি হেসেছে, ভ্যানিটি ব্যাগে পুরতে গিয়ে তার ছোট্ট রুমালখানি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল···কে সসম্ভ্রমে সেখানি কুড়িয়ে দিয়ে অনুরাধার ধন্যবাদ ভাজন হয়েছে এ নিয়ে মজলিস বসে, দস্তুর মত আলাপ আলোচনা হয়।

পূর্ণিমার কোটালে সমুদ্রের ঢেউএর মত অনুরাধা মাঝে মাঝে এমন উচ্ছসিত হয়ে ওঠে মনে হয় সে বুঝি রূপে, রসে, গন্ধে তার সমস্ত ঐশ্বর্য অকৃপণ হস্তে উজাড় করে বিলিয়ে দিতে চায়। এক ঝলক হাসি, এক টুকরো গান, সুরভিত মৃদু নিঃশ্বাস, কখনো বা চাঁপাফুলের মত নরম আঙ্গুলের এক নিমেষের হঠাৎ ছোঁয়া লাগায় বুভুক্ষু মন লুব্ধ হয়ে এগিয়ে যায় আরও কাছে।

হঠাৎ ঠিকরে পড়ে ইলেকট্রিক্ শক্ লেগে।

বিদ্যুৎবর্ষী পাথরের ঘরে ঐ ফুলের মত কোমল মেয়েটির শুভ্র-শয্যা

সে মণিকোঠার কাছে যে এগিয়ে আসে, অনিবার্য আঘাত তাকে পেতেই হয়।

বাইরে অনুরাধা চঞ্চলা, মুক্তধারা তটিনী ; কিন্তু মনের মুক্তা বিন্দুটি তার ঝিনুকের কোষে আবদ্ধ। কেউ তার নাগাল পায় না।

॥ আট ॥

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। একটি হালফ্যাসনের ছোট্ট বাড়ীর সামনে "বুইক" কার্ খানি থামলো। গেটের পাশে ছোট্ট একফালি জমিতে মরশুমি ফুলের বাহার।

বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠতেই অনুরাধা শুনতে পেল রুবির কণ্ঠস্বর ঃ

—ক্লাবের অ্যানিভারসারির জন্য অনুরাধা যা খাটছে সে আর কি বলব !

—আমার নাম করে কি নিন্দে করা হচ্ছে রে পোড়ারমুখি ?

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল অনুরাধা। রুবির ড্রইং রুমে কোচে বসে এক অপরিচিত ভদ্রলোক !

অনুরাধা ভেবেছিল নিশ্চয় তাদেরই ক্লাবের কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছিল রুবি। নইলে তার নাম নিয়ে আলোচনা হবে কেন ? কিন্তু এ যে অপরিচিত ব্যক্তি !

অনুরাধার অবস্থা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল রুবি ঃ

কেমন ? খুব জব্দ হয়েছিস্ তো ? আয়, পরিচয় করিয়ে দিই।

হাত ধরে অনুরাধাকে কাছে টেনে নিল। আগন্তুক ভদ্রলোককে বলল, আমার বান্ধবী, অনুরাধা চৌধুরী, রতনপুর ষ্টেটের জমিদার কন্যা।

এবার অনুরাধার দিকে ফিরে বলল, আর উনি হলেন কুমার মণিশঙ্কর রায় অফ্ শেখরডিহি কেম্।

নাম শুনে চমকে উঠল অনুরাধা। এই সেই শেখরডিহির অত্যাচারী জমিদার, যার কাছ থেকে সে দেবতার সম্পত্তি যে কোন মূল্যে উদ্ধার করে আনবে—বাবাকে সে আশ্বাস দিয়েছিল তাঁর মৃত্যু শয্যার পাশে বসে! অনুরাধার পা থেকে মাথা পর্যন্ত হঠাৎ যেন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। লোকটি তাকে নমস্কার করবার কয়েক সেকেণ্ড পরে তার মনে হল সে প্রতিনমস্কার করতেও ভুলে গেছে। কোন মতে হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করে, অনুরাধা একেবারে ফিরে দাঁড়াল। রুবির হাতে ছাপানো কার্ডখানা দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলল, কার্ড রইল। পরশু যাবি কিন্তু।

সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। রুবি তার হাত টেনে ধরল : সে কি! এই তো এলি, একটু বোস্ না!

—না ভাই, অনেক জায়গা যেতে হবে। আবার সে পা বাড়াল।

—শুনুন।

অনুরাধা থামল।

শেখরডিহির মণিশঙ্কর রুমালে মুখখানা মুছে নিয়ে বললেন—আপনি হয়তো আমাকে অপরিচিত ভেবে বসতে সঙ্কোচ বোধ করছেন। আপনার সঙ্গে আগে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। তবে আপনার বাবাকে আমি জানতুম। একটি ব্যাপারে—

মণিশঙ্করের কথা শেষ হল না। তীব্র দৃষ্টিতে মণিশঙ্করের পানে তাকিয়ে স্পষ্ট ধীর কণ্ঠে অনুরাধা জবাব দিল—সে ব্যাপার আমি জানি, মৃত্যুর আগে বাবা আমায় বলে গেছেন।

ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অনুরাধা।

মুহূর্তের মধ্যে যে কি ঘটে গেল রুবি কিছুই বুঝতে পারল না। একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মণিশঙ্করের দিকে তাকাল।

মণিশঙ্কর স্তব্ধ।

বারান্দায় এসে দেখে অনুরাধার বুইক্ কার্ খানা ডাইনের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সে ফিরে এল ড্রইংরুমে। মণিশঙ্করকে তখনও স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে রুবির বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকল না।

কুমার মণিশঙ্কর! অভিজাত হোটেলে, বারে, নৈশ সম্মিলনে, প্রজাপতির মত দিশি বিদেশী তরুণীর মেলায় অসীম প্রতিপত্তি যাঁর, সেই কুমার মণিশঙ্করকে প্রথম পরিচয়ের দিনেই এমন নির্বাক করে রেখে গেল অনুরাধা!

লাল সাড়ীতে আজ অনুরাধাকে মানিয়েছিল সত্যিই বড় অপূর্ব। চিকণ মাজা সোনার মত ছিপছিপে দেহ ঘিরে লাল সিল্কের সাড়ী। মণিশঙ্করের মনে ছড়িয়ে পড়েছে কি ওই লাল সাড়ীর আঁচল হতে কৃষ্ণচূড়ার আগুন-ঝরানো রঙ?

গোলাপী গালের পাশে দুলছিল নীল পাথরের দুল। ঐ পাথরের নীলাভ বিষ কি নেশা ধরিয়েছে মণিশঙ্করের চেতনায়?

—কি হল? কুমার সাহেব, চুপচাপ বসে কেন?

রুবির প্রশ্ন শুনে অপ্রতিভের মত একটুখানি হেসে ওঠেন মণিশঙ্কর! চেক্ বইয়ের একটি পাতা ছিঁড়ে সামনের টেবিলে রেখে বললেন—ম্যানেজার তার করেছে। জরুরী কাজ, আজই রাত্রের ট্রেনে শেখরডিহি যাচ্ছি। এই রইল তোমাদের ক্লাবের বার্ষিক উৎসবের চাঁদা।...উঠে পড়লেন মণিশঙ্কর।

চেকের টাকার অঙ্কটির ওপর একটিবার অলক্ষ্যে চোখ বুলিয়ে নিয়ে রুবি বলল—

—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে এই ডোনেশনের জন্য! আসল কথা

কিন্তু বললেন না! টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চাইছেন নাকি!…
আবার হেসে ওঠে রুবি!

—কি আসল কথা শুনি?—জিজ্ঞাসা করেন মণিশঙ্কর।

—অনুরাধা হঠাৎ ওভাবে চলে গেল কেন?

—শুনবে, তাহলে? এইবার যেন হঠাৎ আক্রমণের বিহ্বলতা কাটিয়ে মণিশঙ্কর তাঁর স্বাভাবিক বাক্‌পটুতা ফিরে পেয়েছেন। গলার আওয়াজে শাণিত ব্যঙ্গ মিশিয়ে জবাব দিলেন,—
জানো না, ব্যাধ দেখতে পেলে বুনো হরিণী অমনি করেই পালায়।
একটু থামেন, একটু হেসে চাপা গলায় বলেন—

—কিন্তু জানোতো, এ ব্যাধ ইচ্ছে করে নিস্তার না দিলে কোনো হরিণীই এর নাগালের বাইরে যেতে পারে না!

—তা সত্যি! জবাব দেয় রুবি ঃ
তবে কুমার সাহেব হিসেবে হয়তো একটু ভুল করেছেন। কুমার সাহেবের মত সৌখীন শিকারীদের জন্য সংরক্ষিত বনের হরিণী ওটি নয়।

—তবে কি অরক্ষিত বনের? কুমারের চোখে তীব্র কৌতুকী দৃষ্টি।

—ও হরিণী দণ্ডক বনের। সোনার হরিণের গল্প শোনেন নি? অনুরাধা সেই রকম সোনার হরিণী; ওকে ধরতে চাইলে, পরিণামটা একটু ভেবে দেখবেন।
সীগারেট ধরিয়ে এক মুখ কুণ্ডলিত ধোঁয়া ছেড়ে মণিশঙ্কর জবাব দিলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে!

গাড়ীতে উঠে অনুরাধা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হরিশ মুখার্জি রোডে অমিতাদের ওখানে যাবার কথা। ড্রাইভারকে বলল, সোজা গঙ্গার ধার, আউটরাম ঘাট চক্কোর দিয়ে আসতে।

মাথাটা যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, শক্ত করে কপালের দুপাশের শিরা চেপে ধরে ব্যাক্‌সীটে দেহটা এলিয়ে দিল।

এমন আকস্মিক ভাবে কুমার মণিশঙ্করের সঙ্গে দেখা হবে—কখনো সে কল্পনা করেনি।

লোকটির পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ আধুনিক অভিজাত রুচিপূর্ণ; অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক বলে মনে হয়। কিন্তু পুষ্পিত শাল বনের আড়ালে লুকিয়ে ক্ষুধার্ত হিংস্র জানোয়ার যেমন করে শিকারের পানে তাকায় সুরুচির অন্তরালে তেমনি এক বীভৎসতার ছাপ দেখতে পেয়েছে অনুরাধা ওই কুমার সাহেবটির চোখে মুখে।

বাবার রোগশয্যায় বসে সে কথা দিয়েছিল—দেবতার সম্পত্তি যে কোনো মূল্য দিয়ে রক্ষা করবে! কিন্তু ঐ হিংস্র শ্বাপদের মুষ্টি থেকে পারবে কি কিছু বাঁচিয়ে আনতে?…না, অনুরাধা কিছু ভাবতে পারে না, আর ভাববে না। ভাল করে চোখ মুখ দু-হাতে রগ্‌ড়ে নিল।

গঙ্গার ধারের আলোগুলি জ্বলে উঠেছে, বেঞ্চিগুলিতে নানা বয়সী মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমেছে। নৌকোর মাঝিরা কেউ উনুন জ্বালিয়ে রান্না চাপিয়েছে। কেউ বা এক আধ ঘণ্টা নৌবিহার অভিলাষী বাবুদের সঙ্গে দর কষাকষি করছে। ঝির্‌ঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বড় আরাম বোধ হচ্ছিল। অনুরাধা চোখ বুজে বলল: আঃ।

…কতক্ষণ চোখ বুজে ছিল খেয়াল নেই। গাড়ী থামতে, চোখ মেলে দেখল, হরিশ মুখার্জি রোড, অমিতাদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

চূণ-বালি ঝরে পড়া, পাঁজরা বার করা ছোট্ট একতলা বাড়ী, ভাঙ্গা দেওয়ালে হিন্দুস্থানী পানওয়ালী ঘুঁটে দিয়েছে। বর্ষার জলে পঁচে সদর দরজার নীচের দিকটা খসে পড়েছে।

কড়া নাড়তে এই শ্রীহীন বাড়ীটার দরজা খুলে দিল যে মেয়েটি, সে যেন মূর্তিমতি শ্রী! বয়সে প্রায় অনুরাধার সমানই হবে, কিম্বা দু'এক বছরের বড়। রঙ্ ফর্সা নয়, শ্যামলা মেয়েটি, বৃষ্টির জলে ধোয়া ঝাউ গাছের কচি পাতায় যেমন রঙ্ ধরে অনেকটা সেই রকম। পরণে কালোপাড় আটপৌরে মিলের সাড়ী, গলায় লিক্‌লিক্ করছে সরু একগাছা হার। আশ্চর্য সুন্দর দুটি শান্ত চোখ, যেন রাত্রির মত রহস্যময়ী। চোখের ওই অতল, নিঃসীম রহস্য—তাই কি ওর দাদা আদর করে ওর নাম রেখেছিলেন অমিতা!

অমিতার দাদা দীপু আর অনুকে ছেলেবেলায় কলকাতায় আসবার পর থেকেই অনেক দিন ওদের বাড়ীতে গিয়ে পড়িয়েছেন। ইংরেজী কবিতার বই পড়াতে পড়াতে হঠাৎ নিয়ে আসতেন হিন্দু দর্শন, বেদান্তের কথা, বলতেন ভারতের আত্মার বাণী। দুটি কিশোর শ্রোতা তার কতটুকু বুঝল—সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, আপন মনে অনর্গল বলে চলেছেন! হঠাৎ এক সময় থেমে যান। ওদের মুখের পানে তাকিয়ে বলেন—বুঝতে পারছ না, না? আচ্ছা, আরও বড় হও। তখন এসব বুঝবে।

...কিন্তু বড় হয়ে মাস্টার মশাইএর কাছে বেদান্ত-ভাষ্য তাদের আর শেখা হয়নি। কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ একদিন তিনি উধাও হয়ে গেলেন দেশ ছেড়ে। মা-বাপ-মরা ছোট বোন অমিতাকে তিনি সংগ্রামের ভেতর দিয়ে মানুষ হতে শিখিয়েছিলেন। তাই অমিতার ভাবনা তাঁকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারল না।

প্রাইভেট্ ট্যুইশানী করে অমিতা বি, এ পাশ করেছে। সকাল বিকেলে ট্যুইশানী করেই অমিতার দিন একভাবে চলে যায়। একা প্রাণী, একটি বুড়ী ঝি; কিই-বা অভাব তার?

দীপঙ্কর অনেক আগেই অমিতার এখানে চলে এসেছে। হাতে তার একখানি বায়োলজির বই, নতুন বেরিয়েছে; অনুরাধা দরজার কড়া নাড়বার সময় একটি ইণ্টারেষ্টিং চ্যাপটার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল অমিতার সঙ্গে। অনুরাধাকে দেখে বই মুড়ে দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

যা অভিমানী মেয়ে! বাড়ীতে দলিলপত্তর দেখতে ব্যস্ত ছিল, এখন যদি বই নিয়ে ব্যস্ত থাকে, হয়তো কথাটি না বলে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে যাবে।

কিছু মার্কেটিং করতে হবে, আরও পাঁচ-সাত যায়গায় নেমন্তন্ন বাকী রয়েছে। অমিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে দাদাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হল অনুরাধা।

…স্পীড বাড়াও ড্রাইভার! অনেক ঘুরতে হবে যে!

কুমার মণিশঙ্করের কথা দাদাকে বলবে! কি যেন ভাবল অনুরাধা! না, এখন থাক!

লোকটার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই কেমন একটা কালো মেঘের ছায়া সঞ্চার দেখতে পেয়েছে অনুরাধা। শীগগীরই হয়তো একটা ঝড় আসবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক! ঝড় উঠল আর এক দিক থেকে, একেবারে পরিষ্কার, নির্মেঘ, অভাবিত কোণ হতে।

অনুরাধার জন্মদিনে যেসব আমন্ত্রিত তরুণ-তরুণী এসেছিল—নিতান্ত ভদ্রতার খাতিয়ে দু'একটি কথা বলা ছাড়া দীপঙ্কর তাদের সঙ্গে এক রকম মিশলই না! মিশবে কেমন করে?—দোতলার একেবারে কোণের বারান্দায় অমিতাকে ডেকে দুটি চেয়ার টেনে বসে হাসতে হাসতে বলল,—পোটাটো চীপস্ আর সল্টেড্ বাদাম দেখেছেন?

অমিতা কথার মানে ঠিক বুঝতে পারে না।

দীপঙ্কর হলঘরের দিকে আঙ্গুল তুলে বলে—ওই ওরা! ওদের কাছে মেয়েদের দাম ততক্ষণ, যতক্ষণ তারা থাকে পোটাটো চীপস্‌এর মত মুচমুচে। আর ছেলেদের কদর ততক্ষণ, যতক্ষণ তাদের থাকে সল্‌টেড বাদামের মত ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের পুরু কোটিং। জানেন তো···দী ওয়ার্লড ইজ্‌ এ ষ্টেজ্‌! আর সেই ষ্টেজের অডিটোরিয়ামে বিকোচ্ছে ওই সব সভ্যতার অয়েলপেপার মোড়া পোটাটো চীপস্‌ আর সল্‌টেড্‌ বাদাম—চার আনা, আট আনা প্যাকেট দরে! বলেই হো-হো শব্দে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে।

হলঘরে তরুণ-তরুণীদের গুঞ্জরণের মাঝখানেও দীপঙ্করের সেই সশব্দ হাসি শুনতে পায় অনুরাধা। মুখ তার আরক্ত হয়ে ওঠে।

একটু পরেই অমিতা যখন কিছু না খেয়ে বিদায় নিতে এল—অনুরাধার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। একটিবার শুধু জিজ্ঞাসা করল—কিছু খেয়ে যাবে না?

কাকুতি জানিয়ে জবাব দেয় অমিতা—না ভাই, উপায় নেই। ঝি এসে খবর দিল, কে একটি পাগলের মত লোক আমাদের বাড়ীতে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আমাকে এখুনি যেতে হবে। কিছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি।

দীপঙ্কর ভাবে, এতে মনে করবার কি আছে! কে সে লোকটা, হঠাৎ অজ্ঞান হোল কেন—ও বাড়ীতেই বা এল কেন? অমিতা আর বুড়ী ঝি, দুটি মেয়েছেলে মাত্র! এ বিপদে একজন পুরুষ মানুষ কেউ সঙ্গে থাকা দরকার। দীপঙ্করও যাবে কিনা ভাবছে, এক পা এগুতেই অনুরাধার দিকে চোখ পড়ল। কপালের মাঝখানের নীল শিরাটা ফুলে উঠেছে। ওর মানে দীপঙ্কর জানে। ছেলেবেলাতেও দেখেছে অত্যন্ত রাগ আর অভিমান হলে অনুরাধার

কপালের ঐ নীল শিরা ফুলে ওঠে। অসহায়ের মত দীপঙ্কর একটা চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়ল।

অমিতা ততক্ষণে ফটক পার হয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে।···

সে যাই হোক, দীপঙ্কর বুঝতে পারে—অনুরাধার অভিমানের যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। আজ তার জন্মদিন, বাড়ীতে এত সব অভ্যাগত, এ সময়ে তার এমন নির্লিপ্তের মত থাকা উচিৎ হয়নি। সত্যিই অনুর ওপর সে অবিচার করেছে। লজ্জিত হয়ে অনুর কাছে ক্ষমা চাইল নিঃশব্দ মিনতি ভরা চোখে। অতি উৎসাহে অভ্যাগতদের সঙ্গে গল্পগুজব আরম্ভ করল। এই অল্পভাষী মানুষটি এমন অনর্গল কথা বলতে পারে কে জানত!

রাত আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে অভ্যাগতদের অনেকেই চলে গেল; বাকী দু'চারটি মেয়ে যারা শেষ পর্যন্ত ছিল দীপঙ্করকে অনুরোধ করল রাত্রের শোতে সিনেমা দেখতে হবে। লাইট হাউজে নতুন বই—লাভ্স্ প্যারেড। আজ দীপঙ্কর অকৃপণ! যাদের সইতে পারে না, তাদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখতে হবে—এ জুলুমও সহ্য করতে স্বীকৃত হল দীপঙ্কর।

অনুরাধার মনের মেঘ কেটে গেল, মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আনন্দে এবং তার চেয়ে বিস্ময়ে।

তারা রওনা হবে, এই সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

—জাষ্ট্ এ মিনিট, দীপঙ্কর উঠে যায় টেলিফোন ধরতে।

বান্ধবীদের কাছে এবার গরব করে বলে অনুরাধা—আমার দাদাকে তোরা যা ভেবেছিলি, দাদা ঠিক সে রকম নয়। বাইরেটা দাদার কঠিন, কিন্তু মনটা ভারী নরম। বিশেষ করে, আমার জন্য দাদা সব করতে পারে।

—অনু, বড় আশ্চর্য খবর—ফোন রেখে ফিরে এসে বলে দীপঙ্কর,
—অমিতার বাড়ীতে কি হয়েছে জানিস্ ?
জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় অনুরাধা।
—আচ্ছা এখন থাক্। আমি অমিতাদের ওখান হতে ঘুরে এসে বলছি।
—সে কি, মিঃ চৌধুরী ! অবাক হয়ে রুবি বলে ঃ
আমাদের নিয়ে যাবেন না লাভ্‌স্ প্যারেড দেখাতে ?
লাভ্‌স্ প্যারেড্ ! কি একটা শক্ত জবাব দীপঙ্করের ঠোঁটের কাছে এসে আটকে যায়। দ্রুত পায়ে সে বেরিয়ে যায় হলঘর ছেড়ে।

প্রায় আধ মিনিট কাল হলঘরের সবাই চুপচাপ।. রুবি অস্পষ্টভাবে খানিকটা আপন মনেই আওড়াল—এর মানে কি হল, বুঝতে পারলুম না তো !
কপালের সেই নীল শিরাটাকে বাঁ হাতের আঙ্গুলে চেপে ধরেছিল অনুরাধা। হাত সরিয়ে, মাথা ঝাকুনি দিয়ে বলল—
—মানে আবার কি ? বুঝলিনে, দাদার এখন লাভস্ প্যারেড দেখবার সময় নেই। দাদা যাচ্ছে লাভস্ প্যারেড করতে।

তারপর প্রায় পনের দিন কেটে গেল। দীপঙ্করের সঙ্গে অনুরাধার ইতিমধ্যে কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। দীপঙ্কর এত ব্যস্ত যে চান করা, খাওয়ার অবসরটুকু নেই, অনেক রাত্রে সে যখন বাড়ী ফেরে— অনুরাধা তখন হয়তো সবুজ বাতিটায় আড়াল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনদিন যদি বা বই নিয়ে জেগে থাকে, সাড়া দেয় না। অভিমানে চোখ ছলছল্ করে।
কেন ? দাদার কী এমন কাজের চাপ পড়ল যে তাকে ডেকে দুটো কথা বলবার সময় হয় না !

হয়তো কোনদিন বা অনুরাধা কলেজে যাচ্ছে, দীপঙ্কর কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ফিরছে। সিঁড়িতে মুখোমুখি হতেই অনুরাধা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়ায়।

—কলেজ যাচ্ছিস্ বুঝি—এই ধরনের ছোট একটি কথা বলেই জবাবের অপেক্ষা না করে দীপঙ্কর হন্ হন্ করে উপরে উঠে যায়।

রাগে, অভিমানে, অনুরাধার সারা মন এমন তিক্ত হয়ে ওঠে—যে প্রথম ঘণ্টার ক্লাসে প্রফেসারের দেওয়া ইম্‌পরটেণ্ট-নোটগুলোও তার ভাল করে টোকা হয় না।···অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে তার জন্মদিনের ঘটনা।

সেদিন যে লোকটি অমিতার বাড়ীতে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, অনুরাধা পরে খবর· পেয়েছে, তিনি আর কেউ নন—অমিতার দাদা, তাদের ছেলেবেলার মাষ্টার মশাই। অনেক দিন সাউথ-আফ্রিকা না কোথায় ছিলেন। সে দেশে দর্শন বেদান্ত নিয়ে অনেক বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। তারপর কিছু দিন হ'ল হরিদ্বারে এসে আশ্রম করেছেন। কলকাতায় এসেছেন বোধহয় অমিতাকে নিয়ে যেতে। হঠাৎ জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

মাষ্টার মশাইকে অনুরাধা কম শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু তাই বলে দিন নাই, রাত নাই, সর্বক্ষণ তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে, তাঁর হুকুম পালতে ছুটোছুটি করতে হবে—এর কোনই মানে খুঁজে পায় না অনুরাধা।

মাষ্টার মশাই অনুরাধাকেও একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

অনুরাধা বলেছিল—যাবো এক সময়। কিন্তু সে যায়নি। দাদা একাই তো এক শ' হয়েছেন, মাষ্টার মশাইকে নিয়ে বিশ্বসংসার ভুলে গেছেন! তবে অনুরাধাকে আবার কি দরকার? যত রাগ হল অনুরাধার মাষ্টার মশাইয়ের ওপর।

শুধু কি মাষ্টার মশাই? অমিতাই বা কম কিসে? যতটা লাজুক আর ভাল মেয়ে মনে হয়েছিল অমিতাকে, সে মোটেই তা নয়। মিট্‌মিটে ডান্‌।

দীপঙ্করের পাশে গাড়ীতে অথবা পায়ে হেঁটে আজকাল অমিতাকেও প্রায়ই পথ চলতে দেখা যায়—শুভার্থিনী বান্ধবীর দল যথাকালে এ রিপোর্টও বেশ একটু রঙ ফলিয়ে দাখিল করেছে অনুরাধার কাছে!

ব্যারিষ্টার বোসের মেয়ে সুচরিতা, রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট জজ দীনদয়ালবাবুর মেয়ে স্বাতী, ইন্‌টারন্যাশনাল ষ্টোর্সের ক্রোড়পতি মালিকের মেয়ে দেবযানী—কলকাতার আরও কত নামজাদা বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, দাদা রাজী হয়নি। এবার মাষ্টার মশাইএর মাষ্টারণী বোন অমিতা এত বড় সুযোগ হাতে পেয়ে ছাড়তে পারে? কী ভীষণ মেয়ে! ভয়ঙ্কর সেল্‌ফিশ!

বাঁধানো বইএর মলাটে জোরে জোরে আঁচড় টেনে, নিবটিকে নষ্ট করে—মনের আক্রোশ মেটায় অনুরাধা।

॥ নয় ॥

রবিবার সকালবেলা। এলিটে কাল নাচের জলসায় গিয়েছিল অনুরাধা। রুবি, শেলী, আর অন্য যে সব বান্ধবীকে জন্মদিনে ছবি দেখান হয়নি—সঙ্গে ছিল তারা সবাই।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে একটি নাচের দল এসেছে। গোটা ষ্টেজ বরফে ছেয়ে দিয়ে সেই বরফের ওপর নানাধরনের বিচিত্র নাচ। বরফের ওপর লাল, নীল, সবুজ, রামধনু রঙের আলোর ঝিলিমিলি, আর সেই আলোর মধ্যে লাস্যময়ী অর্ধনগ্নদেহ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান তরুণীদের কখনো বা রাজহংসীর মত, কখনো ঘূর্ণী হাওয়ার মত, কখনো বা নীল সাগর-

জলের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত নানা ঢংএর, নানা ছন্দের অবিরাম নাচের হর্‌রা। তরুণীদের খোলা কাঁধে, সুডৌল বাহুতে নীল আলো কেঁপে ওঠে—শ্বেতপাথরে গড়া তাজমহলের গায়ে যেন চাঁদের আলো পিছলে পড়ে।

অনুরাধা সকালবেলা শুয়ে শুয়ে ভাবে সেই নাচের কথা। কখনো দ্রুত তালের নাচ দেখে দর্শকেরা যখন অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে হাততালি দেয়, হাসতে হাসতে মেয়েগুলি পায়ের ঘায়ে বরফের কুঁচি ছড়িয়ে দেয়, বৃষ্টিধারার মত বরফের কুঁচিগুলি এসে পড়ে সামনের দর্শকদের গায়। সারা প্রেক্ষাগৃহ কৌতুকে, উল্লাসে, নানাধরনের আওয়াজে একসঙ্গে যেন কেঁপে ওঠে।

…অনুরাধা ভাবে, মেয়েগুলি সত্যিই কী প্রাণচঞ্চল!

তাদেরও নাচের স্কুলটাকে খুব ভালো করে গড়তে হবে। সাদার্ন-এভিন্যুর জমিটা সে তার ক্লাবকে দিয়ে দেবে নাচের স্কুলের জন্য। শুধু নাচ কেন, সব রকম ললিতকলার চর্চা হবে তাদের ঐ সংস্কৃতি কেন্দ্রে।

বাড়ী তৈরীর জন্য মোটা ডোনেশন তুলতে হবে! যতদিন বাড়ী তৈরী না হয়, ততদিন ক্লাবঘর যেমন তাদের বাড়ীতে আছে—এখানেই থাক।

অনুরাধা বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। বাপ্‌স্! আটটা পঁচিশ! এত বেলা হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিল। এখুনি বেরুতে হবে…আজ সন্ধ্যায় ক্লাবের মিটিং রয়েছে যে—তার তোড়জোড় করতে হবে।

হাল্কা ফিরোজা রঙের একখানি সাড়ী পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। পিঠের ওপর এলিয়ে পড়া একরাশ কালো চুল

আলুগোছে কালো ফিতে জড়িয়ে, মুখের ওপর পাউডার প্যাডটা একটুখানি বুলিয়ে নেবার অবসরে কি একটা গানের কলি ঠোঁটের ফাঁকে গুণ গুণ করছিল।

পুরোনো চাকর কেষ্ট এসে বলল: দিদিমণি, ক্লাব ঘরের চাবিটা?

—ওদিকের তাকে আছে, নিয়ে যা। মুখ না ফিরিয়ে জবাব দেয় অনুরাধা।—শোন কেষ্ট, ক্লাবঘরটা খুলে ভাল করে গুছিয়ে রাখবি। আজ সন্ধ্যোয় আমাদের মিটিং আছে।

—সন্ধ্যেয় কি গো! কেষ্ট অবাক হয়ে বলে, মিটিং যে আরম্ভ হল বলে! তাঁরা সবাই এসে গেছেন।

বিস্ময়ে অনুরাধার ভুরু দুটি কুঁচকে গেল। কেষ্টর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল: কারা এসেছে?

—ঐ নীচে দেখ না দিদিমণি।

কেষ্ট এগিয়ে যায় জানালার দিকে; সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধাও এসে দাঁড়ায়। নীচের বাগানের ধারে—ওরা কারা? একদল ভিখিরী মেয়ে পুরুষ! রাস্তা ছেড়ে ওরা আমাদের বাগানে ভিড় করছে কেন?

—দাদাবাবু বললেন, ওনারা আমাদের বাড়ীতেই থাকবেন। সন্ধ্যের পর নাকি আরও একদল আসবেন।

এইবার অনুরাধার কাছে সব ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাষ্টার মশাইএর হুকুমে দাদার সেবাব্রত এখন থেকে তাহলে এ বাড়ীতেও আরম্ভ হ'ল! কলকাতায় তাদের বসতবাড়ীটি এখন থেকে লঙ্গরখানা, ধরমশালায় রূপান্তরিত হবে!

—চাবিটা নিয়ে যাই দিদিমণি?

কেষ্টর ডাকে চমক ভাঙ্গে অনুরাধার।—না, চাবি নিতে হবে না, তুই যা।

কেষ্ট মাথা চুলকে বলে,—কিন্তু দাদাবাবু যে···

চীৎকার করে ধমকে ওঠে অনুরাধা—কানে শুনতে পাস্‌নি? দূর হ' হতভাগা, এখান থেকে।

কেষ্ট ভড়কে পালিয়ে যায়।

হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটাকে মাটীতে ছুড়ে ফেলে অনুরাধা উত্তেজিত ভাবে বিছানায় বসে পড়ে। নাঃ, এ কিছুতেই হবে না। দাদার সঙ্গে একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হওয়া দরকার। উঠে দাঁড়ায় বিছানা ছেড়ে। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। আবার ভাবে, সে-ই বা কেন যাবে নিজে কথা তুলতে! চাবি দেবে না—এই তার সোজা কথা। ঘরে ফিরে এসে আবার বসে পড়ে।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ; চেনা আওয়াজ। অনুরাধা সোজা হয়ে উঠে বসে।

—কৈরে অনু, চাবি কোথায়? ঘরে ঢুকে হাত বাড়ায় দীপঙ্কর চাবির জন্য।

—ক্লাবঘরের চাবি আমি দেব না।

—চাবি দিবিনে? কেন?

—কারণ, ওটা আমার ক্লাবঘর। ওটা নিতে হলে অন্ততঃ আমার পার্‌মিশনের দরকার আছে নিশ্চয়।···এক নিঃশ্বাসে কথা শেষ করে জানালার দিকে মুখ ফেরায় অনুরাধা।

—ওঃ, স্যিওর্‌!···জবাব দেয় দীপঙ্কর। অনুর কাঁধে বাঁ হাতখানি রেখে একটু নরম সুরে বলে—রাগ করিস নি বোন্‌টি, আমি আগেই আসতুম নিশ্চয় তোকে সব বলতে। কিন্তু হঠাৎ কেমন জ্বর এসে গেল, আর উপরে উঠতে ইচ্ছে করল না।

দীপঙ্কর অবসন্নের মত বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল।

অনুরাধা তেমনি বাইরে তাকিয়ে অনেকটা যেন আপন মনেই বলল:

—জ্বরের আর অপরাধ কি? কলকাতা শহরের যত সব ডাষ্টবিন

আর নর্দমা থেকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড সবই বাড়ীতে কুড়িয়ে এনেছ।

কথার ভঙ্গী দেখে হেসে ওঠে দীপঙ্কর।

অনুরাধা বলে—হাসবার কারণটা কি হল? রাজ্যের ভিখারী আর রুগীকে বসত বাড়ীর ভেতর আমন্ত্রণ করে আনবার মানেটা কি শুনি? দীপঙ্কর আস্তে আস্তে উঠে বসে। শান্ত স্বরে জবাব দেয়—অনু, অমন করে বলিস্‌নে বোন্‌। ওরা বড় দুঃখী। শুধু দু'মুঠো ভাতের অভাবেই—

—বেশ তো! বাধা দিয়ে বলে অনুরাধা,—দুঃখীর দুঃখ দূর করতে চাও, একটা মোটা টাকা ডোনেশন পাঠালেই পারতে! ওদের পালন করবার এত উৎসাহই যদি, তোমার জমিদারীতে কি আর কোথাও স্থান ছিল না ওদের মাথা গোঁজবার?

—আপাততঃ সত্যিই আর স্থান নেই রে—কলকাতায় যেখানে যেটুকু আশ্রয় দেওয়া সম্ভব তা দিয়েছি। এমন কি সাদার্ণ এভিন্যুর সেই পোড়ো জমিটাতে তাঁবু খাটিয়ে অনাথ আশ্রম করেছি।

চম্‌কে ওঠে অনুরাধা। সাদার্ণ এভিন্যুর জমি!

—দেড় হাজারের ওপর আশ্রয়প্রার্থী সেখানে স্থান পেয়েছে, এখন রয়েছে তারা তাঁবুতে। সি, সি, বোস ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের সঙ্গে ব্যবস্থা করছি, শীগগিরই ওখানে পাকা ইমারত তোলবার জন্য।

প্রতিবাদ করে অনুরাধা,—না, সে হতে পারে না।

—কি হতে পারে না রে?

—সাদার্ণ এভিন্যুর জমি আমি আমার ক্লাবকে দান করব। তাদের কথা দিয়েছি, ওখানে তৈরী হবে আমাদের সংস্কৃতিভবন। তার নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে আছে "মানমন্দির।"

—মানমন্দির! অবাক হয়ে তাকায় দীপঙ্কর অনুরাধার পানে।

অনুরাধা বলে,—ভাবীকালের বাংলার তরুণ তরুণীদের সভ্যতা ও

কৃষ্টির পরিমাপ হবে সেখানে। আবিষ্কার করা হবে সেখান থেকে নতুন প্রতিভার গ্রহ উপগ্রহ। একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলে—ওই মানমন্দিরে আমরা একদিন অনুভব করব ভাবী বাংলার চলমান হৃদস্পন্দন।

ম্লান হেসে জবাব দেয় দীপঙ্কর: হৃদয় বাঁচলে তবে তো তার স্পন্দন! দেহ বাঁচলে বাঁচে হৃদয়—আর দেহকে বাঁচায় খাদ্যরস। সেই খাদ্যরস যারা যোগাবে, তাদের এমন অনাদরে অবহেলায় নিঃশেষ করে দিলে বাংলায় বাঙ্গালীর হৃদস্পন্দন জাগবে না অনু, অন্ধকার নিস্তব্ধ কালরাত্রে জাগবে শুধু শ্মশান সুপারিনটেণ্ডেণ্টের বিনিদ্র দেওয়াল-ঘড়ি—ঢং ঢং শব্দ করে।

—সে তুমি যাই বল—আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমার সোজা কথা, সাদার্ণ এভিন্যুর জমিতে তুমি অনাথ আশ্রম করতে পাবে না। আর ওদের জন্য আমার ক্লাবঘরের দরজাও খুলব না।

কথা শেষ করেই দীপঙ্করের জবাবের প্রতীক্ষা না করে অনুরাধা ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে ডাকল দীপঙ্কর—দাঁড়া অনু! ···দীপঙ্করের গলার আওয়াজ একেবারে পাল্টে গেছে। পরিহাস নয়, মিনতি নয়, আদেশও নয়—অত্যন্ত স্পষ্ট অথচ যেন দুর্বোধ্য সে স্বর।

অনুরাধার পাশে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে বলে: —তোর যখন আপত্তি—তখন ওদের থাকবার আমি অন্য ব্যবস্থা করছি। তবে কিছুদিন ধরেই ভাবছি, একটি কথা তোকে বলে রাখা দরকার অনু! সব সময় মনে রাখিস যে, মনুর সৃষ্টি মানুষকে হাইহিল্ জুতোর তলায় মাড়িয়ে চলা, আর হলিউড্ থেকে ব্লাউজের ছাঁট, টলিউড্ থেকে সাড়ীর পার বাছাই করে নিতে জানবার কাল্‌চারটাই মনুষ্যত্বের চরম মানদণ্ড নয়।···

অনুরাধা ঘর ছেড়ে যাচ্ছিল, তার যাওয়া হ'ল না! পাদুটো কে যেন দরজার চৌকাঠের সঙ্গে আট্‌কে দিল।
…ধীর মন্থর পায়ে নীচে নেমে গেল দীপঙ্কর।

যে লোকগুলিকে আশ্রয় দেবে বলে নিয়ে এসেছে দীপঙ্কর, ওদের নিয়ে এখন সে কি করবে? যেখানে হোক, তাদের একটা থাকবার ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার।

•

মাষ্টার মশাই এই তো ক'দিন হ'ল কলকাতায় এসেছেন।
অনেক নূতন কাজের ভার দিয়েছেন তিনি দীপঙ্করকে।

বেশ মনে পড়ে মাষ্টার মশাই-এর সেদিনকার কথা—'বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ নাড়াচাড়া করলুম…শাক্ত, বৈষ্ণব, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদীর কত পুঁথী পড়লুম। সব ঘাঁটাঘাঁটি করে সারমর্ম জেনেছি ঐ একটি কথা—জীবকে যে দয়া করে সে-ই ঈশ্বরের সেবা করে। 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'
জীবে শিব দর্শন, জীবের সেবার চেয়ে বড় ধর্ম আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশে স্থাপিত হয়নি।'
সেই মানুষ আজ অবজ্ঞাত, অত্যাচারিত! সমাজের উপর তলায় যারা রয়েছে নির্মম পেষণে নীচের তলার মানুষগুলির হাড় পাঁজরা তারা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। চুন, বালি, সুরকির মত সেই নর-চূর্ণ দিয়ে গাঁথুনী আর প্লাষ্টারিংএর কাজ হচ্ছে রাজধানীর বড় বড় সভ্যতার ইমারতের!
দীপঙ্কর ঐ নির্যাতিতদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে তার যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে।
এ ক'দিন সে নিরন্ন, নিরাশ্রয় বহু নরনারীকে আশ্রয় দিয়েছে।

আহার যুগিয়েছে। পাঁচ সাতটা ক্যাম্প পড়েছে কলকাতায় আর শহরতলীতে। সেখানে আর জায়গা নেই। তবু উপায় কি?
সঙ্গে ক'জন স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে বাড়ীতে যাদের এনেছিল, সেই লোকগুলিকে সে শহরতলীতেই পাঠিয়ে দিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল পাতিপুকুর ছাড়িয়ে বাগুইআটিতে যে ক্যাম্প আছে, তার পাশের বিশ-পঁচিশ বিঘে জমি বিক্রী হবে এই রকম একটা কথা শুনেছিল! জমিটি তালতলার শিবেনবাবুর। ওটা পেলে সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যায়।
ড্রাইভারকে গাড়ী বার করতে বলে সে সেরেস্তায় ঢুকল। মহেশবাবু উকিল অনেকক্ষণ বসে আছেন, কি সব কাগজ পত্তর সই সাবুদ করিয়ে নেবার জন্য।

অনুরাধার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় রাস্তার বাদাম গাছটা। সকালে বেশ রোদ উঠেছিল, বাদাম গাছের কঁচি পাতাগুলি রোদে ঝলমল করছিল। হঠাৎ ঘোমটার মত কালো ছায়ায় ঢেকে গেল বাদামগাছটির মাথা।
অনুরাধা উঁকি দিয়ে দেখল, মেঘ করে এসেছে। ভীষণ কালো মেঘ। কোন্ খেয়ালী যেন আকাশের তুলট কাগজ থেকে সকালের সূর্যকে মুছে দিয়ে এক দোয়াত ভুসোকালি ঢেলে দিয়েছে! অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকে অনুরাধা সেই আসন্ন-বর্ষণ কালো আকাশের পানে।

—আমার মামণি কোথায়। মামণি গো,—বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন গোলোকনাথ।
এইমাত্র তিনি দেশ থেকে আসছেন। তাড়াতাড়ি ব্যাগটি গোলোক-নাথের হাত থেকে নামিয়ে রেখে অনুরাধা তাঁকে হাত ধরে টেনে এনে বসাল বিছানায় নিজের পাশটিতে। কাঁধের উড়ুনীখানা

নামিয়ে নিয়ে গলাবন্ধ কোটের বুতাম খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলে অনুরাধা :

—ভাল আছেন কাকাবাবু ?

—আর ভাল থাকা ! কোমরে বাতের ব্যথাটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে।

—তবে ব্যথাটা না কমতে চলে এলেন কেন ?

—কি আর করি মা গো ; একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন গোলোকনাথ।—তোমরা কি আমায় স্থির হয়ে দু'টো দিন বসে নির্জনে ঠাকুর দেবতার নাম করতে দেবে ? একটু থেমে অনুরাধার মাথায় হাত বুলিয়ে আবার স্থুরু করেন—আমি একটা বিপদে পড়েছি মা ! তোমায় কিন্তু আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে।

বিস্ফারিত চোখে তাকায় অনুরাধা,—কি বিপদ কাকাবাবু !

—দীপু আমায় এমন এক হুকুম দিয়েছে, যা পালন করা আমার পক্ষে বড়ই মর্মান্তিক। তার চিঠি পেয়েই আমাকে ছুটে আসতে হল কলকাতায়।

দীপঙ্করের নাম শুনেই অনুরাধার মুখের ভাব খানিকটা পাল্টে গেল। ঈষৎ উত্তপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—কি হুকুম দিয়েছেন দাদা ?

—শোন মা, বলছি। গোলোকনাথ ভাল করে উঠে বসলেন। একটু দম নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—জানো তো মা, তোমাদের পূর্বপুরুষ অযোধ্যারাম চৌধুরী স্থাপনা করেছিলেন তোমাদের কুলদেবতা রাধামাধব বিগ্রহ। অযোধ্যারামের আমল থেকেই আজ প্রায় দেড়শ' বছর হল মহাসমারোহে রাধামাধবের নিত্য সেবা হয়ে আসছে।

—সে তো জানি ! কিন্তু আসল ব্যাপার কি তাই বলুন।

—রাস এসে গেছে। রাস উপলক্ষ্যে প্রতিবছর খরচ হয় এগার হাজার থেকে পনের হাজার টাকা। কি কি বাবদ খরচ হয় সব ফর্দ

ধরে দীপুকে পাঠিয়েছিলুম। দীপু তার জবাবে লিখেছে, তোমায় কি বলব মা, আমার মুখে কথা জুয়ায় না।

অধৈর্য হয়ে ওঠে অনুরাধা।—আমি শুনতে চাই কাকাবাবু, বলুন, দাদা কি লিখেছে ?

—তিনশ' টাকার বেশী রাসে সে খরচ করতে দেবে না লিখেছে !

দাদা এই কথা লিখেছে! সে যেন বিশ্বাস করতেই পারে না! অপরিসীম বিস্ময়ে তার কণ্ঠ কেঁপে ওঠে, আর্তস্বরে বলে :

—গোকুলকাকা ?

—হাঁ মা, ঐ কথাই লিখেছে দীপু।···এবার একটা পাঁজর কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, বৃদ্ধের নিস্প্রভ চোখের কোণে জলের চিহ্ন দেখা যায়। আস্তে আস্তে কম্পিত কণ্ঠে বলেন :

—দেড়শ' বছরের ব্যবস্থা সে আজ একটি কলমের আঁচড়ে রদ্ করে দিতে চায়! স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারিনি মা, যে দীপুর মত ছেলে বিলেত থেকে ঘুরে এসেই এমন করে কুলদেবতার—

—না না, সে হতে পারে না,—প্রতিবাদ করে অনুরাধা।—আমি দাদার সঙ্গে কথা বলব, আপনি যান, বিশ্রাম করুন গে !

গোলোকনাথের চোখের জল উচ্ছল হয়ে ওঠে। অনুরাধার মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডান হাত রেখে বাঁ হাতে লুকিয়ে চোখের জল মুছে ফেলেন।

অনুরাধা তাঁকে শান্ত করে এগিয়ে দিতে দিতে বলে,—আপনি হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন গে কাকাবাবু। নিশ্চিন্ত থাকুন,—রাস উৎসবের সব ব্যবস্থা ঠিক থাকবে। অনুরাধার আশ্বাস পেয়ে অনেকখানি স্বস্তি নিয়ে গোলোকনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

॥ দশ ॥

সেরেস্তায় উকিলবাবুর সঙ্গে কাজ শেষ করে দীপঙ্কর যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াল—আকাশ তখন কালো মেঘে একেবারে ছেয়ে গেছে। একটু পরেই হয়তো আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামবে! খানিকটা অপেক্ষা করে বেরুবে কিনা ভাবছে, এমন সময় খবর পেল, দেওয়ানজী দেশ থেকে এসেছেন। দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি চলল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।
—আপনি হঠাৎ চিঠি-পত্তর না দিয়ে! খবর কি কাকাবাবু?—হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করে দীপঙ্কর।...শরীর বেশ ভালো আছো তো?
—হাঁ, তা একরকম—
—জমিদারীতে কোথাও কোন গোলমাল বেঁধেছে নাকি?
—নাঃ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না বাবাজি,—খবর সবই ভা্ল।
আশ্বস্ত হয় দীপঙ্কর। যাক্, তাহলে কোনো দুঃসংবাদ নেই অন্ততঃ।

গোলোকনাথকে তারা দুই ভাইবোনে কতোবার অনুরোধ করে লিখেছে, কিছুদিন কলকাতায় এসে তাদের কাছে থাকতে। ছেলেবেলায় দুটিকে বুকের দুখানি পাঁজরের মত পালন করেছেন গোলোকনাথ। বলতে গেলে দীপঙ্কর আর অনুরাধার মা-বাবা সবই ওই গোলোকনাথ। ইচ্ছে হয়, উনি কিছুদিন কাছে থাকুন, এই বুড়ো বয়সে ওঁর একটুখানি সেবাযত্ন করতে চায় ওরা। কিন্তু জমিদারীর কাজের ভার দুদিনের জন্যও দিতে পারেন—এমন বিশ্বাসী লোক কোথায়? তা'ছাড়া কলকাতার কলের জল, বদ্ধ যায়গা এসব তাঁর মোটেই সহ্য হয় না। এই ধরনের নানা অজুহাত দেখান গোলোক-নাথ। ইদানীং এক রকম দেশেই থাকেন। মন যখন অত্যন্ত চঞ্চল

হয়, চিঠি লেখেন ; দীপঙ্কর, অনুরাধা যে হোক একজন গিয়ে দু'চার দিন তাঁকে দেখে আসে। তিনি নিজে সহজে দেশ ছেড়ে আসতে চান্ না।

কেন যে তিনি দেশ ছেড়ে আসতে চান না—তার কারণ তো কাউকে জানাবার নয়। সে হ'ল তাঁর একান্ত আপন, তাঁর একান্ত নিজস্ব, এক দুর্নিবার আকর্ষণ—ওই বউ-ডুবির খাল।

বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব যে বিশ্বাস না করে, না করুক। কিন্তু তিনি তো জানেন—কেমন করে এক দিন কিশোর দীপঙ্করকে আকর্ষণ করেছিল···শিবানীর অতৃপ্ত মাতৃ-আত্মা !

তারপর কতদিন ঐ খালে সন্ধ্যাকালে বজরা বেঁধে ঘাটে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বসেছেন। হাতের গণ্ডুষে জল তুলতে গিয়ে থম্‌কে দেখেছেন—জলের ওপর ভেসে উঠছে সেই মুখ! বড় করুণ! বঞ্চিত বেদনার তৃষ্ণাভরা দুটি চোখ যেন বলতে চায়—আমার খোকনকে তুমি কোথায় কেড়ে নিলে, আমার কোল খালি করে ?

গোলোকনাথের আর সন্ধ্যা-আহ্নিক হয় না ; কোনো মতে ইষ্ট মন্ত্র জপ করে তিনি উঠে দাঁড়ান।

শীর্ণ বুকের ভেতর থেকে গলা পর্যন্ত একটা চাপা কান্না যেন সাপের মত মোচড় দিয়ে ওঠে।

বৈঠায় ছপ্‌ছপ্ আওয়াজ করে হাটুরেরা হাট করে ফিরে যায়, পার-ঘাটের মাঝি বুড়োবটের শিকড়ের সঙ্গে শেকল দিয়ে খেয়া নৌকা বেঁধে কেরোসিনের ডিবের আলোয় পারানীর পয়সার হিসেব শেষ করে ভিন্ গাঁয়ে চলে যায়, ওপারে খোলের আওয়াজের সঙ্গে হরি-সংকীর্তন এক সময় উচ্চরোল তুলে গভীর রাত্রে ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। বজরায় একা জেগে বসে থাকেন গোলোকনাথ।

নিস্তরঙ্গ নদী চাঁদের আলোয় গলানো রূপোর পাতের মত পড়ে আছে,

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় নূয়ে পড়া কেয়া ঝাড়ের আড়ালে ঢেউ ভেঙ্গে খল্ খল্ করে হাসে, চম্‌কে ওঠেন গোলোকনাথ! ও হাসির ভেতর যেন একটি অতি পরিচিত কণ্ঠের কান্নার সুর চির্ খেয়ে আছড়ে পড়ে!

সারারাত শুনতে পান সেই চাপা কান্নার গোঙানি।

তারপর রাত্রি শেষে যখন শুকতারা দপ্ দপ্ করে জ্বলে, গোলোকনাথ স্পষ্ট দেখতে পান—যেন একটি স্বচ্ছ জ্যোতিশিখা নদীজল হতে উঠে দূর নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে এবং পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে সেই ছায়াপথরূপিণী জ্যোতির্ময়ী শিখা যেন একটি সেতুবন্ধ রচনা করেছে।

—কি ভাবছেন কাকাবাবু? দীপঙ্করের কথায় সম্বিৎ ফিরে পান গোলোকনাথ। তাঁর অন্যমনস্ক ভাব দীপঙ্কর বুঝি লক্ষ্য করেছে! সূতো গুটিয়ে উড়ন্ত ঘুড়িকে যেমন নামিয়ে আনে, তেমনি ছায়াপথ-চারী মনকে আত্মস্থ করতে তিনি কাজের কথা সুরু করলেন।—আমি কলকাতায় চলে এলুম দীপু,—রাধামাধবের রাসের ব্যবস্থাটা তোমার সঙ্গে পাকাপাকি করে যেতে।

—রাসের ব্যবস্থা! বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে দীপঙ্কর:

—আমি তো লিখে জানিয়েছি এবার রাসে তিন শ টাকা পর্যন্ত খরচ করবেন। কেন, চিঠি আপনি পান নি?

চিঠি পেয়েই তো আসতে হল দীপু। গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলেন: কিন্তু বরাবর এগার থেকে পনের হাজার টাকা ঐ রাসে—

বাধা দিয়ে বলে দীপঙ্কর: না, তিন শ' টাকার বেশী কোনোদিন খরচ হয়নি রাস উৎসবে। বাড়তি যে টাকা খরচ হয়েছে প্রতি বছর, তা দেবতার পূজায় নয়, খরচ হয়েছে বাজী পোড়াতে, মেলা বসাতে আর কলকাতা থেকে থিয়েটার সিনেমা নিয়ে যেতে।

গলার স্বর অনেকটা নরম হয়ে আসে গোলোকনাথের—তবু ও সব তো উৎসবেরই অঙ্গ।

—না, ওগুলো বাদ দিয়েও রাধামাধব অনায়াসে রাস যাত্রা করতে পারবেন।

—তবু এতকালের রীতি—তুমি একবার ভেবে দেখ বাবা!

—না ভেবে আমি কিছু করি না কাকা! বাজী পুড়িয়ে নষ্ট করবার মত টাকা আমাদের নেই। টাকার এখন বড় প্রয়োজন।

দীপঙ্কর এ প্রসঙ্গ আর অগ্রসর হতে দিতে চায় না। সে উঠে দাঁড়ায়।

গোলোকনাথ তবু শেষবারের মত বেদনাভরা কণ্ঠে আর একবার জিজ্ঞাসা করেন; তাহলে ঐ তিন শ' টাকাই—

—হাঁ কাকাবাবু, তিন শ' টাকাই। ওর বেশী নয়। দীপঙ্কর বেরিয়ে যেতে পা বাড়াল।

—কাকাবাবু! অনুর কণ্ঠস্বর শুনে দীপঙ্কর গোলোকনাথ দু'জনেই ফিরে তাকালেন। আকাশে আসন্ন ঝড়ের যে ঘনঘটা, বুঝি তার চেয়েও প্রলয়ঙ্কর এক দুর্যোগের পূর্বাভাস অনুরাধার স্থির দৃষ্টিতে, কপালের স্ফীত নীলশিরায়, তার দৃপ্ত ভঙ্গীতে। বক্তব্য বিষয়ের প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট করে গোলোকনাথের মুখের পানে তাকিয়ে বলে অনুরাধা:

কাকাবাবু, আপনি প্রতি বছরের মত এবারও উৎসবের আয়োজন করুন। রাস উপলক্ষে যে যে উৎসব হয়, তার এতটুকু অঙ্গহানি হবে না। তার জন্য পনের কেন—যদি বিশ হাজার টাকাও খরচ হয়, তা রতনপুর ষ্টেটে আমার শেয়ার হতে খরচ করবেন। অনেকটা আদেশের মত কথা ক'টি বলে অনুরাধা চলে যাচ্ছিল। হতবাক্ দীপঙ্কর ডাকল তাকে:

—অনু, দাঁড়া।

—কি ?—তেমনি দৃপ্ত ভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়ায় অনুরাধা।

—এতগুলো টাকা তুই এভাবে খরচ করবি ?

—হাঁ, বাবা ঠাকুরদা যা করে গেছেন, আমাদেরও তাই করতে হবে।

—তাঁরা যদি ভুল করে থাকেন, তা'হলে আমাদেরও সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে হবে ?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করে অনুরাধা :

—তাঁরা যদি ভুল করে থাকেন, সে ভুলের বিচারক তুমি নাকি ?

গোলোকনাথ কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের মতো এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ছিলেন। অনুরাধাকে কাকুতির স্বরে ডাকলেন :

—মা মণি ! আর নয়, মা মণি !

দীপঙ্করের চোখে উত্তেজনার আভাস দেখা গেল। গম্ভীর স্বরে সে গোলোকনাথকে বলল :

—আপনি যান্ কাকাবাবু ! আমি যা বলেছি, মনে রাখবেন।

ভাই বোনের এ সর্বনাশা দ্বন্দ্বের যাতে সেইখানেই বিরতি হয়—এই আশায় বৃদ্ধ গোলোকনাথ তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব শেষ হবার নয়। অনুরাধার কথা শুনে তাঁকে থাম্‌তে হল।

—আপনি দাঁড়ান কাকাবাবু !

দীপঙ্করের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—

—তার মানে, তুমি বলতে চাও, রাস উৎসবে ঐ তিন শ' টাকার বেশী খরচ করতে তুমি দেবে না ?

দীপঙ্করের জবাব ছোট্ট একটি :

—না।

—উৎসবের অঙ্গহানি হবে ?

—হোক—!

—যদি তার ফলে আমাদের পিতৃ পিতামহের আত্মা ক্ষুব্ধ হয় ?

—আমি জানি, ক্ষুব্ধ তাঁরা হবেন না।

—আর আমি যদি বলি, তাঁরা নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হবেন?

অনেকটা নির্লিপ্তের মত জবাব দেয় দীপঙ্কর:

—ক্ষুব্ধ হন, আমি নিরুপায়।

—যদি আমাদের গৃহদেবতা রাধামাধব ক্ষুব্ধ হন? যদি দেবতার অভিশাপ আমাদের বংশের ওপর এসে পড়ে?

মনের সুদৃঢ় সঙ্কল্পকে ম্লান হাসির আবরণে সহজ করবার ভঙ্গীতে জবাব দেয় দীপঙ্কর:

—কোনো সেন্‌টিমেণ্টাল কথা বলেই আমাকে টলাতে পারবি নে অনু! দেশের মানুষগুলি যখন না খেয়ে শুকিয়ে মরছে—তখন বাজী, বন্দুক আর বাঈজীর নাচে টাকা খরচ না করবার অপরাধে যদি দেবতার অভিশাপ রতনপুরের চৌধুরী বংশকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় তো দিক্ না। বাংলার এই মহাশ্মশানে একটা চৌধুরীবংশ নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটা খুব বড় কথা নয়!

—হাঁ, চৌধুরী বংশ জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হওয়াটা বড় কথা নয়। কারণ যখন চৌধুরীদের বাড়ী পুড়বে, সেই আগুনের বাইরে দাঁড়িয়ে তুমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে!

—তার মানে? চৌধুরীবংশের অগ্নিকাণ্ড আমাকেই বা রেহাই দেবে কেন? অবাধ্য সন্তান হতে পারি, তবু তো আমি এই বংশেরই—

অনুরাধার দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায় প্রাচীন জমিদার বংশের আভিজাত্যময় রক্তধারা গলিত অগ্নি প্রবাহের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই ভীষণ মূর্তি দেখে গোলোকনাথ প্রমাদ গণলেন। বাঘিনীর মত গর্জ্জে উঠে সে বলে:

—না, তুমি এ বংশের কেউ নও। তুমি চৌধুরীবংশের অন্নদাস।

...আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে ভয়ংকর শব্দে বজ্রপাত হল! প্রকাণ্ড বাড়ীটার ভিত্তি শুদ্ধ পায়ের তলায় অজগরের মত দুলে উঠল! বন্দী

দৈত্যের রুদ্ধ আক্রোশের মত একটানা হাওয়ার গর্জনে কানে বুঝি তালা লেগে গেল! ঝাঁকে ঝাঁকে তীরের মত বৃষ্টিধারা বিঁধে মাটির বুক থেকে বুঝি মৃত্যু-যাতনায় নীল বিষ বাষ্প হয়ে উঠতে লাগল!

বজ্রাহত, স্তম্ভিত দীপঙ্কর যখন সম্বিৎ ফিরে পেল, তাকিয়ে দেখে অনুরাধা সেখানে নেই, দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন শুধু গোলোকনাথ।

—কাকাবাবু!

দীপঙ্করের ডাক শুনে মুখ তুলে তাকালেন গোলোকনাথ! মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন এক নিমেষে শুষে নিয়েছে! মৃতের মত রক্তহীন বিবর্ণ মুখ! চোখ নিস্প্রভ পাথরের মত!

—আপনি একবার বলুন কাকাবাবু, আমি চৌধুরীবংশের কেউ নই? আমি এ বংশের অন্নদাস?

গোলোকনাথের আচ্ছন্নভাব তখন কাটেনি, দৃষ্টি তেমনি অর্থহীন, স্থির। মাটিতে বসে শীর্ণ দুই হাঁটুতে দু'হাতে ঝাকুনি দিয়ে অস্থির কণ্ঠে বলে দীপঙ্কর:

—আমি আপনাকে চুপ করে থাকতে দেব না কাকাবাবু। আমায় আর কিচ্ছু লুকোবেন না। স্পস্ট করে বলুন, আমি শ্রীপতি চৌধুরীর সন্তান কি না?

যন্ত্রচালিতের মত জবাব আসে:

—না!

—তবে আমি কার সন্তান!

এতক্ষণে একবার নড়ে ওঠেন গোলোকনাথ! কি জবাব দেবেন,—ইতস্ততঃ করেন। দীপঙ্করের আর্ত জিজ্ঞাসা—

—বলুন, আমি কার সন্তান!

নিজেকে সামলে নেন্ গোলোকনাথ, একটু ছলনার আশ্রয় নিয়ে থেমে থেমে বলেন:

—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা মরবার সময় তাঁর দুই মাসের শিশুটিকে চৌধুরী মশাইকে দিয়ে যান্। সে ব্রাহ্মণকন্যাও নেই, একমাত্র তুমি ছাড়া আজ আর তাঁর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই।

—আমার মা, বাবা, কেউ নেই!···অনেকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। বাইরে আকাশে শুধু ঝড়ের মাতামাতি। অন্ধকার দেওয়ালের ওপর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকে অন্ধকার যেন আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

এক সময় গোলোকনাথের মনে হল, পায়ের ওপর কী যেন ভারী তপ্ত বোঝা! তাকিয়ে দেখেন দু' হাতে তাঁর পা দু'খানি ধরে ললাট স্পর্শ করে প্রণাম কর্চ্ছে দীপঙ্কর।

—আসি কাকাবাবু!

—কোথায় যাবে তুমি! প্রতিবাদ করে বলেন গোলোকনাথ,—কোথাও যেতে হবে না দীপু, রতনপুর ষ্টেটের অর্ধেক অংশের মালিক তো তুমিই।

ম্লান হাসি খেলে যায় দীপঙ্করের মুখে।

—যে বস্তুর আমি অধিকারী নই, অজ্ঞাতে তা নিজের বলে গ্রহণ করেছি বলে আপনি কি মনে করেন কাকাবাবু, সব জেনে শুনেও আমি তার কণামাত্র গ্রহণ করব?

—কিন্তু চৌধুরী মশাইএর উইল! তোমার রতনপুর ষ্টেটে—

—কোন কথা নয় কাকাবাবু; এই মুহূর্ত হতে রতনপুর ষ্টেটের একমাত্র উত্তরাধিকারী অনুরাধা।

দরজা পর্যন্ত এসে সামনে বাধা পেল। দু' হাতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে অনুরাধা! চোখের পাতা ফুলে উঠেছে, গলার আওয়াজ ভারী হয়ে গেছে। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে সে ডাকল:

—দাদা!

—বাধা দিস্ নে বোন! আমায় যেতে দে!

—কোথায় যাবে তুমি?

—এত বড় বিরাট পৃথিবীতে যাবার যায়গার অভাব কি দিদি?

—কোনো মতেই কি তোমার এ বাড়ীতে থাকা চলে না?

দীপঙ্করের মুখে এক বিচিত্র হাসি! এ হাসি অনুরাধা চেনে; এর একমাত্র অর্থ—'না, কোন মতেই না।'

অনুরাধা একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল, দীপঙ্করের পানে তাকিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল; ঠোঁট দু'টি থর থর করে কেঁপে উঠল। পর মুহূর্তেই সে মাথা নত করল। দরজা ছেড়ে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল:

—সত্যিই যে চলে যাবে স্থির করেছে, তাকে মিছে বারণ করব না আমি। কিন্তু যাবার আগে রতনপুর ষ্টেট থেকে তোমার যা কিছু প্রাপ্য, তোমার নিয়ে যেতে হবে।

অপরাধীর মত জবাব দেয় দীপঙ্কর:

—ফাঁকি দিয়ে অনেক নিয়েছি রে। যাবার সময় আর অপরাধের বোঝা ভারী করব না।···অনুরাধা তাকে যেটুকু যাবার রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিল সেই পথে এগিয়ে চলে দীপঙ্কর।

ডুবন্ত মানুষ যেমন ভেসে ওঠবার শেষ চেষ্টা করে ঠিক সেই ভাবে আর একটিবার প্রশ্ন করে অনুরাধা:

—শোনো, রতনপুর ষ্টেট থেকে, এ সংসার থেকে, এ বাড়ী থেকে তুমি কি কিছুই তোমার সঙ্গে নিতে পার না?

—যা নিতে পারি, সে আমি ভুল করে ফেলে যাবো না বোন্। এ বাড়ীর সঙ্গে আমার পঁচিশ বছরের স্মৃতি—সারা জীবনের পথে এই স্মৃতিই আমার পাথেয় হয়ে থাকবে! চেষ্টা করলেও একি কেউ কখনো ভুলতে পারে?

দীপঙ্করের চোখের পাতা ভিজে আসে। শেষ দিকের কথাগুলি

কেমন যেন ভেঙ্গে চূরে জড়িয়ে আসে। আর কোন দিকে না তাকিয়ে সেই অবিশ্রাম বৃষ্টিধারার মধ্যে তার মূর্তি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট এবং শেষে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

অনুরাধা সেই যে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দীপঙ্কর চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও ঠিক সেইখানে, সেইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল! গোলোকনাথ পা টিপে টিপে কাছে এগিয়ে এলেন! সন্তর্পণে তার মাথায় হাত রাখলেন। অনুরাধা দু' চোখ তুলে ফিরে তাকাল!

সর্বহারা বৃদ্ধ আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকলেন ঃ

—মা! মাগো! মা মণি আমার!

সেই স্নেহের উচ্ছ্বাসে জমাট ব্যথা গলে টপ্ টপ্ করে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ল অনুরাধার দুই গালে! গোলোকনাথের কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ে শিশুর মত ডুক্‌রে কেঁদে বলল ঃ

—বাবা মারা যাবার সময় বলেছিলেন; কিন্তু তখনও আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করিনি। আজ আমি সত্যিই বুঝতে পারলুম কাকাবাবু, যে ও আমার মায়ের পেটের ভাই নয়। সত্যিই যদি ও আমার দাদা হত—পারত কখনও আমায় এমন শাস্তি দিয়ে একা ফেলে চলে যেতে! পারত না! কখনো পারত না!

কে কার প্রশ্নের জবাব দেবে? গোলোকনাথ অনুরাধা—দুই অসমবয়সী, একই পরম শোকের সঙ্গী, অশ্রু-বাষ্পে দু'জনারই কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে!

॥ এগার ॥

লছমণঝোলার কাছে ধ্রুবঘাট। শোনা যায় পিতৃপরিত্যক্ত কিশোর রাজকুমার ধ্রুব এই খানেই তার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে প্রেমের ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

ধ্রুবঘাট থেকে পাঁচ সাত মিনিট বাঁ দিকে এগিয়ে গেলেই "আনন্দ আশ্রম।" স্বামী সেবানন্দ, দীপুর মাষ্টার মশাই পাহাড়ের গায়ে এই আশ্রম স্থাপনা করেছেন। তাঁর নিজের স্বাস্থ্য কিছু দিন ধরে ভেঙ্গে গেছে, তা ছাড়া সেবানন্দের আশ্রিত গুটি পনের অনাথ ছেলেমেয়ে আছে। তাদের জন্য এখানে ছোট্ট একটি স্কুল করা যায় কি না—তাই অমিতাকে তিনি সঙ্গে এনেছেন।

হরিদ্বার রওনা হবার জন্য তাঁরা মালপত্তর বেঁধে তৈরী হয়েছেন এই সময় ঝড়জলের মধ্যে দীপঙ্কর এসে হাজির হল। বলল, সেও তাঁদের সঙ্গী হবে! মাস্টার মশাই বিস্মিত হলেন, একটু পরিহাসচ্ছলে বললেন ঃ

—তুমি লোটা-কম্বলধারীদের সঙ্গে যাবে···কিন্তু তোমার রাজগি ?

মৃদু হেসে জবাব দেয় দীপঙ্কর ঃ

—সে পাট একেবারে চুকিয়ে এসেছি দাদা, রাজবাড়ীর সব দরজা পেছন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। পথের মানুষ, পথে এসে দাঁড়িয়েছি। এই পথ চলার অধিকারটুকু···এ আমার একান্ত নিজস্ব।

সব কথা শুনে সেবানন্দ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অমিতার চোখ ছল ছল করে এলো। দীপঙ্করের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে একটু পরে সেবানন্দ বললেন ঃ

—রাজবাড়ীর বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছ। আমি জানি এ

মুক্তিকে তুমি বিধাতার পরম দান বলেই মেনে নিতে পেরেছ। তোমার পথ চলবার অধিকার আমি অস্বীকার করব না দীপু। এই অধিকার যারা খর্ব করতে চায় তাদের তুমি কখনো ক্ষমা কোরো না।···

তিন জনে রওনা হলেন হরিদ্বার।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ। মোটরের রাস্তা। চন্দ্রভাগা নদী শুকিয়ে ইতস্ততঃ পাথরের টুক্‌রো ছড়ানো বিস্তীর্ণ বালুকাময় পথ। সেই বালির ওপর দিয়ে চন্দ্রভাগা নদী পার হয়ে এঁকে বেঁকে খাড়া পাহাড়ে উঠ্‌ছে গাড়ী।

এক একটা বাঁক পার হয় আর যাত্রীরা ভাবে এক একটি মস্ত বড় ফাঁড়া কাটছে।

পাহাড়ের গা কেটে যে সঙ্কীর্ণ পথটি তৈরী হয়েছে—তার বহু নিম্নে গঙ্গাধারা! খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে তাকালে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে! গাড়ী যে কোনো মুহূর্তে এক হাত, আধ হাত সরে গেলে একেবারে ঐ অতল মৃত্যুপুরীতে নেমে যাবে, গাড়ী বা যাত্রীর চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভয়-ত্রস্ত যাত্রীদের অনেকেই ড্রাইভারকে অনুরোধ করে একটু আস্তে চালিয়ে যেতে।

যাত্রীরা যত কাকুতি করে গাড়োয়ালী ড্রাইভার গাড়ীতে তত স্পিড্ বাড়িয়ে দেয়।

নীচে অতল গহ্বর, সামনে বিরাট বাঁক, ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ী মোড় ঘুরতে, যাত্রীরা চোখ বুজে স্মরণ করে ইষ্ট দেবদেবীর নাম!

গাড়োয়ালী ড্রাইভার গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠে পাহাড়ী প্রেমের গীত··· কোন্ পর্বতবাসিনী প্রণয়িণীকে উদ্দেশ করে!

হাওয়ায় ভেসে আসে এক ঝলক তীব্র সুরার গন্ধ।

অমিতা ও দীপঙ্করের মুখেও উদ্বেগের আভাস দেখে মৃদু হেসে বলেন সেবানন্দ,—এই গাড়োয়ালী ড্রাইভারগুলি অসম্ভব এক্স্পার্ট! প্রমত্ত পদ্মানদীতে যেমন ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে পাড়ি দেয় পদ্মার মাঝি, এই গাড়োয়ালীরাও সঙ্কটময় পার্বত্য পথকে তেমনি এতটুকু ভয় পায় না। ছেলেবেলা থেকেই এই পথের সঙ্গে ওদের পরিচয়।

এক সময় ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে জল নেয়। যাত্রীদের বলে,—বাবুজি, মাঈজি, তোমরা মা গঙ্গার সঙ্গে কথা বলবে না?

মা গঙ্গার সঙ্গে কথা! নতুন যাত্রী যারা, বিস্মিত হয়ে তাকায় অনেকেই ড্রাইভারের মুখের পানে।

ড্রাইভার বলেঃ এখানে "হর্ হর্ ব্যোম" বলে হাঁক দিলে মা গঙ্গাও জবাব দেবেন। বলেই ড্রাইভার দুই হাতের মুঠো চোঙ্গার মত করে মুখের সামনে ধরে হাঁক দিলঃ হর্ হর্ ব্যোম। সঙ্গে সঙ্গে অতি উদাত্ত অশরীরী কণ্ঠের ভীম গর্জন পাহাড় কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনিত হল,—হর্ হর্ ব্যোম···হর্ হর্ ব্যোম।

কৌতূহলী যাত্রীর দল, স্ত্রী পুরুষ সবাই অনির্বচনীয় উল্লাসে হুঙ্কার দিয়ে উঠল; সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে চারিদিক হতে প্রত্যুত্তর এল গম্ভীর, অলৌকিক, মেঘচুম্বী হিমালয়ের মত অন্তহীন, বিরাট সে ধ্বনি!···

জল নিয়ে গাড়ী আবার ছোটে গন্তব্য পথের দিকে···তখনও ভেসে আসে সেই একটানা উদাত্ত স্বর—হর্ হর্ ব্যোম···হর্ হর্ ব্যোম। যাত্রীরা ভাবে এ কণ্ঠস্বর কার? যৌবন-চঞ্চলা জহ্নুসুতা সপত্নী গৌরীর বাঁকা ভুরুর শাসন উপেক্ষা করে শিবের জটায় লুকোচুরি খেলা করতে করতে সত্যিই কি ফেনিলোচ্ছল কণ্ঠে ব্যোমকেশকে স্মরণ করে বলেন,—হর্ হর্ ব্যোম—হর্ হর্ ব্যোম!···দু' হাত

তুলে প্রণাম জানায় তা'রা পতিতপাবনী স্বর্গ-গঙ্গা আর গঙ্গাধরের উদ্দেশ্যে।

আনন্দ আশ্রমে এসে প্রথম প্রথম দীপঙ্করের সময় বেশ ভালই কাটছিল। সকালবেলা ঘণ্টা দুই স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়াতে অমিতাকে সে সাহায্য করে। তারপর সারাদিন দীর্ঘ অবকাশ। অমিতার সঙ্গে হিমালয়ের নির্জন প্রদেশে ঘুরে বেড়ায়।
দীপঙ্করের মনে হয় এ যেন এক বিচিত্র শান্তির রাজ্য। বিরাট নগাধিরাজ, কুয়াসার ভস্ম-আবরণ মেখে ধ্যান-গম্ভীর মূর্তিতে বসে আছেন। সর্পিল বেস্টনীতে জটা বেয়ে গা বেয়ে খেলা করছেন দ্রবীভূতা হরিচরণচ্যুতা গঙ্গাধারা! গঙ্গার এ অপরূপ মূর্তি দীপঙ্কর কখনো কল্পনাও করতে পারেনি; নীল অপরাজিতা ফুলের মত রঙ, উপলখণ্ডে আহত হয়ে ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো হীরকচূর্ণ। এই স্রোতবেগ ধারণ করতে গিয়ে ভীমকায় ঐরাবত একদিন ভেসে গিয়েছিল···উদ্দামবেগে ধাবমান গঙ্গার পানে তাকিয়ে এ কথাকে আর কবি-কল্পনা বলে বোধ হয় না।
স্নানের ঘাটে শিকল বাঁধা। সেই শিকল ধরে এক মুহূর্তের মধ্যে ডুব দিয়ে তাড়াতাড়ি মাথা তুলে নিতে হয়—ভয় হয় খরস্রোত বুঝি মাথা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!

সেদিন বিকেলের দিকে লছমণঝোলা পেরিয়ে গেল তারা। ডান দিকে স্বর্গদ্বার, এই পথে পঞ্চ পাণ্ডব গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। বাঁয়ে কেদার-বদরির পথ। এ পথটা লছমণঝোলার কাছে দুর্গম নয়। পায়ে হেঁটে অনেকটা দূর উপরে উঠে গেল দীপঙ্কর আর অমিতা। কত শতাব্দীর কত পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর পদরেণু রয়েছে ঐ পথের ধূলায় মিশে। বড় ভাল লাগল পথটিকে।

—হো-হো-হো উ—

কোনো দূরপথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে কিশোর কণ্ঠের ধ্বনি। এ নির্জনে কোথা থেকে ভেসে আসে এ কিশোর কণ্ঠ! উৎকর্ণ হয়ে শোনে তারা! সামনে পিছনে তাকায়; কই, কেউ তো নেই!

—হো-হো-হো-উ—

আবার সেই ধ্বনি! অমিত্রা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে হাত বাড়িয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে ঃ

—দেখুন! দেখুন!

তারা যে পথে যাচ্ছিল তার বাঁ দিকে বহু নিম্নে কলকল করে গঙ্গাধারা বয়ে চলেছে। গঙ্গার বুকে বড় বড় পাথরের খণ্ড। সেই পাথরে আঘাত পেয়ে রাজহাঁসের ডানার মত রাশি রাশি শাদা ফেনা যেন প্রকাণ্ড পেখম মেলেছে। আর সেই শাদা ফেনার চালচিত্রের সামনে পাথরের ওপর লাল ঘাঘড়া পরা একটি বুনো কিশোরী মেয়ে বেণী দুলিয়ে মনের আনন্দে চীৎকার করছে—

হো-হো-হো-উ—

কী দুঃসাহস ঐ মেয়েটার! গঙ্গার মাঝখানে ঐ পাথরের ওপর গেল কী করে! এই পথচিহ্নহীন খাড়া পাহাড়, নীচের দিকে তাকাতেও ভয় করে, ওখানে ও নামল কেমন করে!

কিশোরী খিল্‌খিল্‌ করে হাসে। একটি পাথর থেকে আর একটি পাথরের ওপর লীলায়িত ভঙ্গীতে লাফিয়ে পড়ে, লঘুপদক্ষেপে অতি অনায়াসে পাথরের পর পাথর ডিঙ্গিয়ে নীল ধারা আর শাদা ফেনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এক সময় হাওয়ায় ভেসে আসা পাতাটির মত অদৃশ্য হয়ে যায়!

দীপঙ্কর অমিতা বিস্মিত হয়ে ভাবে—ওকি মানুষ! না বন্যপ্রকৃতি একটি মানবশিশুর মূর্তি ধরেছিল! অথবা হিমালয়দুহিতা পার্বতী সপত্নী বিদ্বেষ ভুলে জহ্নু কন্যার সঙ্গে খেলায় মেতেছিলেন!

আরও খানিকটা পথ এগিয়ে তাদের বিস্ময়ের অবসান হল। হাঁ, সেই লাল ঘাঘড়া পরা মেয়েটিই তো! কখন কোনদিক থেকে ওপরে উঠে এল!

ওদের দেখে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে অপরিসীম কৌতূহল। অমিতা আদর করে কাছে ডেকে পরিচয় জেনে নিল। ওর নাম রুক্‌মিণী; মা-বাপ নেই, বুড়ো ঠাকুর্দা পাহাড়ী কাঠের গুঁড়ি কেটে যন্তর দিয়ে খুঁড়ে তা থেকে পেয়ালা, ডিস্, লোটা, এই সব তৈরী করে। লছমণঝোলা, হরদোয়ারা আর কন্‌খল থেকে সওদাগররা ফি হপ্তায় আসে। তারা সেগুলি দু'চার পয়সা দামে কিনে নিয়ে যায়। চড়া দামে বাজারে বিক্রী করে। হুঁ, রামপিয়ারীর ভাতিজা নিজে দেখে এসে বলেছে, চার পয়সার প্লেট এক শেঠজী ছ' আনা দিয়ে নিয়ে গেল!

রুক্‌মিণী ওদের কিছুতেই ছাড়বে না। ওদের বাড়ী যেতেই হবে। ঐ তো একটুখানি ওপরে ঐ টিলাটার ওপরে ওদের ঘর। দীপঙ্কর অমিতার পানে তাকাল। অমিতা হেসে বলল ঃ

—বেশ তো, চলুন না। কাছেই যখন, যাওয়া যাক।

কাছেই? হাঁ, রুক্‌মিণীর হিসাবে কাছে। কিন্তু অমিতার মনে হল এ পথের যেন শেষ নেই। আর পথই বা কোথায়? এব্‌ড়োথেব্‌ড়ো খাড়া পাহাড়, পাথর ধরে বড় বড় গাছের শেকড় ধরে কোন রকমে উঠতে হয়, একবার পা পিছলে গেলেই—ব্যস্, আর কথা নেই! মেয়েটা কাঠবেড়ালির মত লাফিয়ে লাফিয়ে তর্‌তর্ করে অনেক ওপরে উঠে

গেছে। অমিতা হাঁপিয়ে পড়ে। দীপঙ্কর ক্লান্ত হেসে, কপালের ঘাম মুছে ফেলে হাত বাড়িয়ে দেয়—

—বড্ড হাঁপিয়ে গেছেন। আমার হাত ধরে উঠুন।

—না, না, ঠিক পারব আমি! চলুন না। অমিতা নূতন উদ্যমে চলতে চেষ্টা করে।

—হ্যাঁরে, রুক্‌মিণী, আর কত দূর রে?

রুক্‌মিণী আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এসে গেছি, উ-ই যে!

এসে গেছে তো কতবার বলছে, কিন্তু আর যে পারা যায় না! মেয়েটা কি দুষ্টু! ওর জন্যেই তো এই খাড়াপাহাড় ভাঙ্গতে হল! একটু সহানুভূতি দেখানো দূরে থাক, ক্লান্ত অমিতার থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে ওপরে ওঠার ব্যঙ্গ অনুকৃতি করে, আর বেহায়ার মত খিলখিল করে হেসে ওঠে! আচ্ছা, মেয়েতো! অমিতার এবার সত্যিই রাগ হচ্ছে মেয়েটার ওপর।

যাক্, সত্যি-সত্যিই এসে পড়েছে তারা! কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় চক্রাকার, অনেকটা দেখতে চরকার মত একটি ধারালো যন্ত্র ঘুরছে। আর সেই যন্ত্রের সাহায্যে নানা ধরনের লোটা, বাটি তৈরী করছে এক অতি বৃদ্ধ পাহাড়ী কারিগর!

লোকটার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য! যেন মহাভারত-বর্ণিত পিতামহ ভীষ্মের মত এক ইচ্ছামৃত্যু কালজয়ী পুরুষ…এই পাহাড়ের মধ্যে অজ্ঞাত বাস করছে।

লোকটা সবিস্ময়ে রুক্‌মিণীর দিকে তাকাল। রুক্‌মিণী তার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে কী যেন বলে পালিয়ে গেল।

এইবার বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওদের অভ্যর্থনা করতে। দীপঙ্কর আর অমিতাকে দুটি কাঠের আসন এগিয়ে দিয়ে বসতে অনুরোধ

করল। তারপর সুরু করল অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে পাহাড়ী জীবনের নানা সুখদুঃখের কথা।

একটু পরে রুক্‌মিণী এল। দু'হাতে তার সোনার মত ঝক্‌ঝকে করে মাজা দুটি বড় গ্লাস থেকে উপচে পড়ছে এই মাত্র দুইয়ে আনা ঈষৎ উষ্ণ দুধের ফেণা!

রুক্‌মিণী নিজে দু'য়ে এনেছে, ও দুধ তাদের খেতেই হবে।

বৃদ্ধের অনুরোধ আর বিশেষ করে রুক্‌মিণীর দু'টি উজ্জ্বল চোখের করুণ মিনতি এড়ানো গেল না।

তারপর লোটায় করে এলো ঝরনার জল। রুক্‌মিণী বলে—মিঠে পানি। সত্যিই সে জলের এক আশ্চর্য মিষ্টি স্বাদ!

—আজ উঠি তা হলে! আর একদিন আসব। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। রুক্‌মিণীর দাদু রুক্‌মিণীকে বলল সঙ্গে করে নীচের সেই পায়ে চলা পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে!

রুক্‌মিণী সে পথ তো বটেই···আরও অনেকটা দূর অনর্গল কথা বলতে বলতে সঙ্গে এল।

ফেরবার সময় কথা আদায় করে নিয়ে গেল আবার আসতে হবে কিন্তু। ···সঞ্চারিনী ছায়ামূর্তির মত দীর্ঘ বনশ্রেণীর মধ্যে সে মিলিয়ে গেল। তারপর জ্যোৎস্নালোকে নিঃশব্দে পথ চলতে চলতে তারা যেন বার বার শুনতে লাগল ডাইনে খাদের নীচে এক কিশোরী মেয়ে খিলখিল করে হাস্‌ছে, কখনো বা চীৎকার করে বলছে ঃ

হো-হো-হো-উ—

* * *

রুক্‌মিণীদের ডেরায় তারা প্রায়ই আসে। আজকাল ওখানে না গেলে সে দিনটাই যেন কেমন অসম্পূর্ণ···অস্বস্তিকর বোধ হয়। গোড়ার

দিকে রুক্‌মিণী তাদের পায়ে চলা পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিত। এখন তাদের কাছে পথটা পরিচিত হয়ে গেছে।
রুক্‌মিণীর আর তাদের সঙ্গে আসবার দরকার হয় না। এমন কি পাহাড় ভেঙ্গে পথ চলতে তাদের পরিশ্রম হলেও আর কষ্ট হয় না।
আস্তে আস্তে পাশাপাশি দুটিতে পাহাড় থেকে নামে।
নামবার সময় প্রায়ই রাত হয়ে যায়। বড় বড় গাছের গুঁড়িতে ছায়া পড়ে, পাতার ফাঁকে ঝরে চাঁদের আলো।
জনমানবহীন আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। যক্ষপুরীর নিকষ কালো দেওয়াল দিয়ে পৃথিবী থেকে একটি স্বতন্ত্র স্বপ্নলোক তৈরী হয়েছে।
পাহাড়ের চূড়া থেকে চাঁদের রশ্মি বেয়ে বায়বীয় দেহে কারা যেন নেমে আসে।
ঝরণার ঝর্‌ঝর্‌ রবে, পাতার মর্মরে বেণু বীণা বেজে ওঠে।
বুঝি কল্পলোকের গন্ধর্ব, কিন্নর মিথুনের দল আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়, গান গায়, কানের কাছে মুখ নিয়ে কপোত কপোতীর মত অস্ফুট প্রণয়-কূজন করে।

আলোছায়া ঝিলিমিলি, আলপনা-আঁকা পথ। আলপনা জাগে না কি পাশাপাশি পথ চলা এই দুটি তরুণ-তরুণীর মনের গহনে ?

কখনো বা দুটিতে শিলাখণ্ডের ওপর বসে পড়ে। এলোমেলো হাওয়ায় দীপঙ্করের চোখে-মুখে উড়ে পড়ে অমিতার সাড়ীর আঁচল …এলোখোঁপার একটু সুরভি…দু'একটি নরম চুল। অমিতার কানের কাছে, গলায়, কাঁধে ছোঁয়া লাগে দীপঙ্করের আতপ্ত নিশ্বাসের।
মুখে কথা থেমে যায়, মুখর হয়ে ওঠে মন।
দু'জোড়া স্তব্ধ চোখের আরশিতে ফুটে ওঠে সেই মুখর মনের ছায়া।

এক অনাস্বাদিতপূর্ব, দুর্নিবার আকর্ষণ!
চমকে ওঠে এক সময় তারা!
কক্ষহারা উল্কার মত এ কোথায় চলেছে—কোন অনির্দিষ্টের পানে?

॥ বার ॥

আজ দু'দিন হ'ল আনন্দ আশ্রমে কানপুর থেকে একটি বাঙালি পরিবার এসেছে। বৃদ্ধা কাত্যায়নী দেবী, তাঁর আট-দশ বছরের নাতি। ওঁদের তদারক করতে সঙ্গে এসেছে কাত্যায়নী দেবীর এক দূর-সম্পর্কের দেওরের ছেলে।
গত বছর কুম্ভমেলায় স্নান করতে এসে সেবানন্দের সঙ্গে পরিচয়। পাঁচ সাত দিন থাকবেন ওঁরা এই আশ্রমে।
বিকেলের দিকে অমিতা দীপঙ্করকে বলল ঃ
—আজ আর আমার বেড়াতে যাওয়া হবে না। ওঁরা রয়েছেন—দেখাশুনো করতে হবে। যাই কী করে!
—সে তো বটেই! আচ্ছা, একাই তা হলে ঘুরে আসি—
দীপঙ্কর এগিয়ে গেল লছমণঝোলা পার হয়ে।

শুধু সেই একদিন নয়; অমিতাকে আজকাল আর মোটেই পাওয়া যায় না বেড়াবার পথে সঙ্গী হিসেবে। সেই নীলধারা, সেই ফেনোচ্ছ্বাস, সেই পরিচিত বন-শ্রেণী,—পাহাড়ের চূড়ায় তেমনি করে চাঁদের আলোর ঝরনা নামা। একা একা পথ চলতে দীপঙ্করের মনে হয়—সবই তেমনি সুন্দর!···সৌন্দর্য আছে কিন্তু লাবণ্য নেই এতটুকু।
ডালপালা শুদ্ধ গাছের পাতা দমকা হাওয়ায় মর্মরিত হয়ে ওঠে—কিন্তু কিন্নর মিথুন নাচে না! ফিস্‌ফিস্ করে কথা কয় না!

থেকে থেকে বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে বাষ্পের মত কি যেন একটা কিছু গলা পর্যন্ত উঠে আসে ! কেন এমন হয় ?···

জগতের সব চেয়ে দুরূহ আবিষ্কার বোধ হয় নিজের মনকে আবিষ্কার করা।

এসিডে খাদ পুড়িয়ে যেমন করে খাঁটী সোনা বার করা হয়—অমিতার সঙ্গ না পাবার এই দুঃসহ বেদনার প্রদাহে জ্বলে পুড়ে দীপঙ্কর আবিষ্কার করতে চাইছে তার মনের অন্ধকার পাতালপুরীর রহস্য !

আশ্রমে যতক্ষণ থাকে কাজের অবসরে অমিতা তার সেবা-যত্নের এতটুকু ভুলচুক্ করে না ; অথচ কি যেন একটা অতি সূক্ষ্ম আবরণে সে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায় !

কেন ?

দীপঙ্কর ডুব দেয় মনের অতলে।

সেদিন গভীর রাতে গঙ্গার ধারে পায়চারি করতে করতে দীপঙ্কর এক সময় ক্লান্ত হয়ে ধ্রুবঘাটের কাছে একখানি পাথরের ওপর বসে পড়ল। যাত্রী, সন্ন্যাসী কেউ নেই ঘাটে, চারদিক নিঝুম হয়ে এসেছে। গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউএর মত অজস্র ঢেউ ওঠা নামা করছে দীপঙ্করের মনে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল। মাটীতে তার ছায়া পড়েছে। মাথার ওপর প্রাচীন অশ্বত্থের ডাল কেঁপে কেঁপে তার ছায়ার ওপর মাঝে মাঝে ছায়া সঞ্চার করছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল মায়াবী অশ্বত্থ-ছায়া যেন কোথা হতে আর একটি ছায়াকে টেনে এনে তার ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইছে। মানুষের ছায়া ! এলো চুলের দোলায়িত ছায়া ! বিস্মিত হয়ে দীপঙ্কর মুখ তুলে তাকাল। পেছনে প্রায় তার কাঁধের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অমিতা !

—এত রাত্রে আপনি এখানে?—অপরিসীম বিস্ময় ঝরে পড়ল দীপঙ্করের কণ্ঠস্বরে।

আলগোছে তার পাশে এসে বসে অমিতা।

—আপনাকেও তো ঠিক সেই প্রশ্ন করতে পারি আমি। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করেঃ

—ঘুম পাচ্ছে না বুঝি?

মাথা নেড়ে জানায় দীপঙ্কর—না!

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে বসে থাকে। একেবারে চুপ।

তারপর দীপঙ্কর বলেঃ

—আপনাকে একটা কথা বলব অমিতা দেবী?

দু' পায়ের গোড়ালির কাছে প্রসারিত দু'টি হাত আবদ্ধ করে জানুর ওপর মাথা নামিয়ে বসেছিল অমিতা। দীপঙ্করের কথা শুনে জানুর ওপর তেমনি মাথা রেখে একটু ঘাড় কাৎ করে আড় চোখে তাকাল তার দিকে!

—ভাবছি, এবার আমি এখান থেকে চলে যাব।

সোজা হয়ে উঠে বসে অমিতা!

—কোথায় যাবেন?

—যেখানেই হোক! এখানে তো কোন কাজ নেই তেমন। একটা কিছু কাজকর্ম খুঁজে নিতে হবে।

অমিতা দূর পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি মেলে দেয়। ঝঙ্কার দিয়ে থেমে যাওয়া তার-যন্ত্রে যেমন একটু মৃদু কাঁপন অনেকক্ষণ লেগে থাকে—সেই রকম একটু অস্পষ্ট, অতি মৃদু স্পন্দন জাগে তার কণ্ঠস্বরে। অনেক দূরের কাউকে লক্ষ্য করে যেন অনেকটা আপন মনেই বলেঃ

—আর আমি যদি বলি আপনি পালিয়ে যেতে চাইছেন?

দীপঙ্কর চমকে ওঠে।

তারপর একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে বলে ঃ

—মহুয়া গাছে ফুল ধরে, বড় ভাল লাগে, কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দেয়। প্রাকৃতিক নিয়মে ফুল ধরে। ওটা অস্বাভাবিক নয়, বরং ওই গাছের ধর্ম। কিন্তু তা বলে ফুলন্ত হয়েছে বলেই সব মহুয়া গাছের বাঁচবার অধিকার নেই। ফুল পাতাশুদ্ধ ডাল কাটে, গোড়া কাটে কুড়ুল দিয়ে। তারপর সেগুলি হয় জ্বালানি কাঠ। আমরা পড়েছি ওই জ্বালানি কাঠের দলে। জ্বালানি কাঠের মত পুড়ে যাওয়াই আমাদের ভাগ্য, আমাদের কি ফুলের মায়া করে বসে থাকা চলে ?

অমিতা মিনিট কয়েক চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর দীপঙ্করের চোখের পানে তাকিয়ে বলল ঃ

—আপনার মন···সে আপনারই ভাল জানা আছে দীপঙ্করবাবু। আর কারু তা জানবার কথা নয়। তবে, একটি কথা, দেখেছেন তো পাহাড়ী পথ চলতে দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে হাল্কা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। কোন্ দিক থেকে আসছে টের পাওয়া যায় না। যদি কোনো বিশেষ ফুলের গন্ধ আপনাকে কখনো আচ্ছন্ন করে থাকে —তবে তাকেও সেই হাওয়ায় ভেসে আসা অজানা ফুলের গন্ধ মনে করলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না! যেদিক থেকে ফুল ফোটার সম্ভাবনায় আপনি পালিয়ে যেতে চাইছেন—কে আপনাকে বলল যে ফুলটি সেই দিকেই ফুটেছে ?···

এ আঘাতে দীপঙ্কর সাড়া দিল না। মাথা নীচু করে বসে থাকল।

একটু পরে ম্লান হেসে অমিতা আবার বলল ঃ

—আপনাকে ধরে রাখব না। তবে যাবার আগে হয় তো আর বলবার সুযোগ পাব না, তাই আজই বলে রাখছি ঃ কোন দিন আপনার দিক থেকে যদি পালাবার আর কোন তাগিদ না থাকে—যদি নিজের মনে বুঝতে পারেন—আমাকে কাছে পেলে আপনার উদ্বেগের কারণ

হব না—সেদিন আমাকে ডাকতে ভুলবেন না। আমাকে আপনার কাজের সঙ্গী করে নেবেন।

দীপঙ্করের চোখের কোণে দু ফোঁটা জল চক্ চক্ করতে লাগল। মাথা নীচু করে লুকিয়ে চোখ মুছে যখন আবার তাকাল—অমিতা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

॥ তের ॥

রতনপুরের রাসের মেলা এবার আর তেমন জমে নি। কলকাতার বাঈ নাচ, সিনেমা কিছুই আসে নি। বাজী পোড়াবারও ব্যবস্থা হয়নি। আশেপাশের গ্রাম্য হাট থেকে মনিহারী দোকান, কাপড়ের দোকান এই সব এসেছে। কাজুলী, বামুনকান্দা প্রভৃতি গাঁয়ের হরিসভার উৎসাহী কীর্তনিয়ারা এসে আসর জমিয়েছে।

অনুরাধা নিজেই শেষ পর্যন্ত রাসের সমারোহ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে বলেছে। তাই গোলোকনাথ অন্যান্য বছরের মত এবার আর কোনো আয়োজন করেন নি।

রাস উৎসব নিয়ে কলহের পরিণতি স্বরূপ দীপঙ্করের সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে যাওয়াটা এই অনাড়ম্বর রাসের প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। শেখরডিহির কুমার মণিশঙ্করের শিকারী বাজপাখীর মত লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল রতনপুরের ওপর।

রাসের এক সপ্তাহ আগে কুমার মণিশঙ্কর তাঁর দেওয়ান হরনাথকে ডেকে বললেন ঃ

—রতনপুরের দেওয়ান গোলোকনাথকে চিঠি লেখ, রাস উৎসব তাঁরা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করুন, আমার আপত্তি নেই। তবে পরিবর্তে রাসেশ্বরী শ্রীমতীটিকে আমি চাই!

দেওয়ান হরনাথ কুমার বাহাদুরের কথার মানে বুঝতে না পেরে—কলমের ডগা দিয়ে মাথা চুলকাতে থাকে।

কুমার বাহাদুর ধমকে ওঠেন :

—তোমার নীরেট মগজে কলমের খোঁচায় বুদ্ধির উদয় হবে না। স্পষ্ট করে বলছি শোনো—রাজত্ব ছেড়ে দেব, যদি রাজকন্যা পাই।

—যে আজ্ঞে। বশংবদ হরনাথ প্রভুর বক্তব্য বিষয়টি বেশ মুন্সীয়ানা করে লিখে জানাল রতনপুরের দেওয়ানজিকে।

চিঠি পড়ে গোলোকনাথের সর্বাঙ্গ অসহনীয় ক্রোধে থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল। লম্পট, মাতাল, স্বৈরাচারী মণিশঙ্কর! তাকে বরণ করে তিলে তিলে মরবার চেয়ে অনুরাধার পক্ষে মৃত্যুবরণ করাও ভাল।

…অনুরাধাও যে সে কথা ভাবে নি—তা নয়! কিন্তু মৃত্যুবরণ করলে তো দেবতার সম্পত্তি রক্ষা পাবে না! অনেক ভেবে সে মন স্থির করে করে ফেলল। গোলোকনাথকে বলল :

—আপনি চিঠির জবাব দিন কাকাবাবু। শেখরডিহির প্রস্তাব আমরা মেনে নেব।

—সে কি মা? তুমি বলছ কি!—গোলোকনাথের দুই চোখে অপরিসীম আতঙ্ক, বিস্ময়!—ওই কুমার মণিশঙ্কর—

—কোনো কথা নয় কাকাবাবু। স্থির কণ্ঠে জবাব দেয় অনুরাধা :

—শেখরডিহির কুমারের পরিচয় আমি বেশ ভাল করেই জানি। তবু আমার সঙ্কল্প স্থির! এর অন্যথা হবে না।…

গোলোকনাথ বজ্রাহতের মত বসে থাকেন।

—এত ভাবছেন কী কাকাবাবু! মনে পড়ে বাবার মৃত্যুশয্যায় তাঁরই পাশে বসে আমি দু'টি কথা দিয়েছিলুম তাঁকে! প্রথমটি রাখতে পারিনি, তার ফলে দাদা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। বাবার একটি

আদেশ অমান্য করেছি, কিন্তু আর না। তাঁর আত্মাকে আর আমি বঞ্চনা করতে পারব না কাকা, কিছুতেই নয়।—দেবতার সম্পত্তি যে কোনো মূল্য দিয়ে হোক—আমাকে রক্ষা করতেই হবে।···একটু থেমে উদ্গত অশ্রু গোপন করে অনুরাধা যেন অনেকটা আপন মনেই বলে ঃ

—সীতাকেও অগ্নি পরীক্ষায় পার হতে হয়েছিল। এও তেমনি আমার ভাগ্যদেবতার অগ্নি পরীক্ষা। শেখরডিহির প্রস্তাব মেনে নিন কাকাবাবু, তাদের আজই চিঠি লিখে দিন্।

তাই হ'ল।

অনুরাধাকে শেখরডিহি আসতে হ'ল শেখরডিহির জমিদার বাড়ীর বধূ হয়ে।

তাহ'লে সোনার হরিণীকে ধরা দিতে হল ব্যাধের জালে? মায়ার হরিণীও বন্দী হয় তবে?···কিন্তু ধরা না-দেওয়া হয়তো ছিল ভালো।

অনুরাধা যে স্বেচ্ছায় তাকে বরণ করেনি মণিশঙ্কর তা ভাল করেই জানে। পরাজয় মেনে বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে তাকে! কিন্তু এই পরাজিত শত্রুটি তারই গৃহে এসে তাকে যে নতুন করে পরাজিত করবে—মণিশঙ্কর স্বপ্নেও কল্পনা করেনি!

মেয়েটি বেশী কথা বলে না; কিন্তু তার স্বল্প ভাষণ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তার মধ্যে এমন একটি অবিচলিত গাম্ভীর্য বজায় থাকে যে কোনো কথার প্রতিবাদ করবার সাহস হয় না। এই ক'দিন হল এ বাড়ীতে সে এসেছে। আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন হয়ে উঠেছে সম্রাজ্ঞী, মণিশঙ্কর যেন তারই বিচারালয়ের সঙ্কুচিত অপরাধী!

—মদ খেয়ে কেউ আমার কাছে আসে—এটা আমি পছন্দ করি না।

মদের গন্ধ পেয়ে প্রথম দিনেই বলেছিল অনুরাধা। মণিশঙ্কর বাড়ীতে মদ খাওয়া বন্ধ করে দিল। বহুকালের অভ্যস্ত নৈশ-বিলাস অন্যত্র সমাধা করে গভীর রাত্রে চোরের মত পা টিপে বাড়ীতে ঢুকত। ঘুমন্ত অনুরাধার পানে তাকিয়ে একটি সতৃষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ত।

অনুরাধা এতরাত্রে নিশ্চয় ঘুমিয়েছে এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সেদিন ঘরে ঢুকতে গিয়ে মণিশঙ্কর দরজার বাইরে একবার দাঁড়িয়ে পড়ল। জানালার কাছে চুপ করে বসে আছে অনুরাধা, দৃষ্টি তার আকাশের দিকে। সন্তর্পণে পকেট থেকে কিছু এলাচ লবঙ্গ বা'র করে মুখে ফেলে দিয়ে সে অনুরাধার কাছে এগিয়ে এল।

—এখনও জেগে বসে? ঘুমোওনি কেন? ওঃ, আমি আসি নি—তাই?

কোন জবাব এল না।

অত্যন্ত দরদ ভরা নরম সুরে আবার বলল মণিশঙ্কর:

—না, না, এমন করে আমার জন্য রাত জেগো না। জমিদারীর কাজ কর্মের নানান্ ঝামেলা, ফিরতে হয় তো আমার প্রায়ই রাত হবে। আমি তো তোমায় আগেই বলেছি, রাত জেগে শরীর খারাপ কোরো না। তুমি ঘুমিয়ে পড়'!

কথা বলতে বলতে মণিশঙ্কর একটু ঝুঁকে পড়েছিল অনুরাধার দিকে। অনুরাধা কী একটা তীব্র গন্ধ পেয়ে একটিবার···শুধু এক মুহূর্ত মণিশঙ্করের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

—তুমি আবার মদ খেয়েছ!

—কই, না তো! মণিশঙ্কর তাড়াতাড়ি একটু সরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল: কে বললে?

শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল অনুরাধাঃ আমি বলছি খেয়েছ।

মণিশঙ্কর আমৃতা আমৃতা করে বলেঃ আমি তো শুধু একটু পান মশলা—

বাধা দিয়ে বলে অনুরাধাঃ

—মশলা চিবিয়ে মদের গন্ধ ঢাকা যায় না—এ কথা কি মাতালকে আমায় শিখিয়ে দিতে হবে?

এইবারে আত্মসম্মানে ঘা লাগল বুঝি মণিশঙ্করের।

—তুমি আমায় মাতাল বলছ!

—যারা মদ খায়, তাদের ও ছাড়া আর কি বলে তা জানি না।

অনুরাধার নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করে মণিশঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই মেয়েটির শাসনের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ সে মনে মনে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছিল। পাঁচটি বড় পেগ্ ফ্রেন্স্ হুইস্কি তার রক্তে ঈষৎ উষ্ণতা সঞ্চার করেছিল। একটু ঝাঁঝালো স্বরেই জবাব দিলঃ

—মদ খাব আমার খুসি। জীবনে কারু কাছে জবাব দিহি করি নি, কখনও করবও না।

—আর কারুর কাছে জবাবদিহি না কর, এ কথাটি মনে রেখো, নিজের স্ত্রীর কাছে অনেক সময় অনেক কাজেরই জবাবদিহি করতে হয়।

বিস্ময় লাগে মেয়েটার দম্ভ দেখে! গলার আওয়াজে আরও চড়া সুর জাগেঃ

—না—না! কড়ি দিয়ে কিনলুম দড়ি দিয়ে বাঁধলুম সে জাতের স্বামী আমি নই। আমি কোনো জবাবদিহি করব না!

—বেশ। এখন থেকে নিজের শোবার ঘরে যত খুসি মদ আনিয়ে খেয়ো। কেউ নিষেধ করবে না! এর জন্য আঁস্তাকুড়ে যেতে হবে না আর!···কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল অনুরাধা।

—কোথায় যাচ্ছ ?

—যেখানে আমার খুসি !

—খুসি ! ইচ্ছে হলেই যেতে পার তুমি ?

—পারি কিনা দেখ।

—দাঁড়াও।…মণিশঙ্কর অনুরাধার হাত চেপে ধরল।

—হাত ছেড়ে দাও। মদ খেয়ে আজ তুমি এতখানি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছ যে জোর করে ধরে রাখতে চাও ? ছিঃ।…অনুরাধা একটি ঝাঁকুনি দিতেই মণিশঙ্কর হাত ছেড়ে দিল। তার দৃষ্টিতে ছিল তীব্র ভৎর্সনা; মণিশঙ্কর চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পারল না। মরিয়া হয়ে শুধু একবার বলল ঃ

—কিন্তু এই রাত করে কোথায় যাচ্ছ, আমায় বলে যেতে হবে। দৃপ্ত ভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়াল অনুরাধা।—যে স্বামী স্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করতে চায় না, তেমন স্বামীর কাছে আমিও জবাবদিহি করি না। আমি সে জাতের স্ত্রী নই।…

মাথার বেণীটি খুলে পড়ল, ঘাড়ের পাশ দিয়ে স্পন্দমান বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাপিনীর মত দুলে উঠল। ছোবল খাওয়া মানুষের মত মণিশঙ্কর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। খোলা দরজা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অনুরাধা।

বারান্দার বাঁদিকেই ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে লঘু অথচ ক্ষিপ্র পায়ের শব্দ শুনতে পেল মণিশঙ্কর। অনেকক্ষণ বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকল। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালবেলা অনুরাধার সঙ্গে যখন দেখা হল—তখন সে সদ্য স্নান শেষ করে এসেছে। পিঠের ওপর ভিজে চুলের রাশি এলিয়ে

দিয়ে এক মনে প্যাডের ওপর কি যেন লিখছে। অপরাধীর মত আস্তে আস্তে কাছে এল মণিশঙ্কর।

—শোন, আমার একটি কথা ছিল।

অনুরাধা মৌন থেকে শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল।

নীল পদ্মদলে যেন রক্ত চন্দনের প্রলেপ লেগেছে।

মণিশঙ্কর বুঝতে পারল, কাল সারা রাত তা হলে অনুরাধা ঘুমোয়নি! খুব সম্ভব এই সকালবেলা তার কাকাবাবুকে চিঠি লিখতে বসেছে—তাকে রতনপুরে নিয়ে যাবার জন্য।

—কাল রাত্রে যা বলেছি···অন্যায় যা করেছি তার জন্য মাফ কোরো। আমি মদ আর খাব না।

—আচ্ছা!

ছোট্ট জবাব দিল অনুরাধা।

আপন মনে চিঠি লিখতে লাগল।

একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে মণিশঙ্কর সেখান থেকে চলে গেল।

মণিশঙ্কর মদ ছেড়ে দিল। শুধু মদ নয়, সান্ধ্য মজলিস্ পর্যন্ত ত্যাগ করল। বাড়ীর বা'র হয় না। জমিদারীর যেটুকু কাজ একান্ত না করলে নয়—এক আধ ঘণ্টা সময় অত্যন্ত সংক্ষেপে সেইটুকু শেষ করে' নিজের ঘরে একা একা চুপ করে বসে থাকে। আকাশ পাতাল কী যে ভাবে সে-ই জানে। অনুরাধার চোখে চোখ পড়তে অপরাধীর মত চোখ নামিয়ে নেয়।

অপরিসীম ক্লান্তিতে দেহ তার অবসন্ন এবং তারপর একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। থেকে থেকে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, সমস্ত শরীর থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। ডাক্তার রোগের নাম বললেন—'ডি, টি'। এতদিনের অভ্যাস, হঠাৎ সে অভ্যাস ছাড়া চলবে না। ডাক্তার "মেডিসিনাল ডোজে" মদ খেতে উপদেশ দিয়ে গেলেন।

মণিশঙ্কর ম্লান হেসে বলল ঃ

—আচ্ছা, দেখি !···

অনুরাধা পাশে এসে দাঁড়াল।

—ডাক্তার যখন বলছে, একেবারে না ছেড়ে একটু একটু খেলেই তো হয়।

অন্য দিকে তাকিয়ে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগল অনুরাধা।

একটু স্তব্ধতা।

তার পর সেই একই জবাব এল ঃ

—আচ্ছা, দেখি।···

মণিশঙ্করের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল। এইবার অনুরাধা দস্তুর মত ভয় পেয়ে গেল! মদ খাওয়া বন্ধ করতে গিয়ে এ বিপত্তি ঘটবে—সে কল্পনা করতে পারে নি। অনুরাধাকে জব্দ করবার জন্যই যেন ব্যাধির উপসর্গগুলি এত প্রবল হয়ে উঠেছে।

অনুরাধা নিজেও তো সেদিন মণিশঙ্করকে একটু একটু মদ খেতে বলেছে ; তবু কেন সে মদ আর ছোঁয় না ? একি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ! শেষে নিরুপায় হয়ে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ডোজ ঠিক করে ব্রাণ্ডি সুদ্ধ গ্লাস নিয়ে অনুরাধা মণিশঙ্করের পাশে এসে বসল···

—নাও, এইটুকু খেয়ে ফেল।

মণিশঙ্কর বিস্মিত হয়ে তাকাল অনুরাধার দিকে।

—কি ভাবছ ? খাও।—অনুরাধা ব্রাণ্ডিটুকু তার মুখে ঢেলে দিল।

মণিশঙ্কর নিঃশব্দে পান করল এবার বিনা প্রতিবাদে।

মণিশঙ্করের কাঁপুনি আস্তে আস্তে থেমে গেল, দেহে স্বাভাবিক উত্তাপ ফিরে এল। স্বস্তিতে চোখ বুজে এল। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙতে মনে হল—তার কপালের ওপর কে যেন এক মুঠো নরম যুঁইফুল রেখে দিয়েছে। হাতের মুঠোয় ধরা পড়ল একখানি সুকোমল কম্পিত করপুট। মেঘের চালচিত্রের সামনে নিপুণ শিল্পীর গড়া প্রতিমার মত একরাশ কালো চুল এলিয়ে অনুরাধা বসে আছে তারই বুকের এত কাছে!

তাকাতে ভরসা হয় না; স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়!

চোখ বুজে গাঢ় স্বরে সে ডাকে:

—অনুরাধা! অনু!

জবাব আসে না। মুঠোর ভেতর বন্দী যুঁইফুলের রাশ শুধু আর একবার যেন ঝিরঝিরে হাওয়ায় কেঁপে ওঠে!

একটি মিষ্টি গন্ধ থেকে থেকে ভেসে আসে।

পাতা নড়ে। ঘন পল্লবিত চোখের পাতা।

জল পড়ে···টুপ্ করে···শিশিরের ফোঁটা!

মণিশঙ্করের কপালে লাগে আতপ্ত অশ্রুর স্পর্শ।

আবার আর একটি বড় ফোঁটা!

—অনু, তুমি কাঁদছ?···সাড়া দেবে না? কিন্তু কেন কাঁদো?··· আমি তো মদ খেতে চাই নি; তুমিই তো আমায় হাতে করে দিয়েছ।···বিশ্বাস করো, তুমি না দিলে আমি ও-জিনিষ আর কখনো খেতাম না।···

উচ্ছ্বাসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল অনুরাধা। মণিশঙ্করের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

মণিশঙ্কর সন্তর্পণে তাকে দু'হাতে বেষ্টন করে আরও নিবিড় ভাবে কাছে টেনে নিল। মনে হল যেন ভয়ার্ত পারাবত তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থর থর করে কাঁপছে!

তারপর ক্লান্ত হয়ে শুধু উষ্ণ কোমল স্পর্শ রেখে অশান্ত পাখি ঘুমিয়ে পড়ে।

মণিশঙ্কর মুখখানি একবার তুলে ধরে দেখে মুদিত চোখের ঘন-পল্লব রেখায় তখনো মুক্তার ঝালর টলমল করছে।

অনুরাধা হার মেনেছে। ঝড়জলে পালক ভেজা…ডানা বন্ধ করা… বিপর্যস্ত পারাবত! বুকের ভেতরটা থর্ থর্ করে।

মণিশঙ্করকে আবার মদ না ধরালে কি হত? পরিমিত মাত্রা জ্ঞান সে কোথায় পাবে? অপরিমিত, উচ্ছৃঙ্খলতা তার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। দু'চার দিনের মধ্যেই তার স্বাভাবিক রূপ একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগল।

সে মদ ছেড়েছিল কেন? সে কি কারু কথায়? কারু অনুরোধে? সুদৃশ্য বোতলে পরিপূর্ণ রঙীন বিদেশী সুরার দিকে তাকিয়ে তার মনে জাগত আর একটি সুরার নেশা!

তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ স্বচ্ছ কোমল ত্বকের আবরণে উচ্ছ্বসিত সুরার মত রক্তিম আভা।

কাছে থেকেও ওকে পাওয়া দূরে থাক, ছোঁয়া-ও যায় না।

ঐ না-পাওয়া জীবন্ত সুরার নেশায় মণিশঙ্কর মদ ছেড়েছিল, ছেড়ে দিয়েছিল নিশি-জাগর সঙ্গিনীদের।

তার পর ক্রূর ভাগ্যের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়ে অনুরাধা যখন তার কাছে ধরা দিল, আস্তে আস্তে মণিশঙ্কর-ও তার মুখোস খুলতে লাগল।

সকালবেলা খবরের কাগজখানি পরম আগ্রহে হাত বাড়িয়ে নিয়ে পড়া হয়ে গেলে যেমন অনাবশ্যক বোধে এক কোনে ফেলে দেওয়া হয়—মণিশঙ্করের কাছে মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহলও সেই রকম অত্যন্ত উগ্র অথচ সংক্ষিপ্ত। তবে ওদের মধ্যে অনুরাধা যেন বহুবর্ণ-

রঞ্জিত, বহু রম্য রচনা সমৃদ্ধ একটি বিশেষ সংখ্যা! একবার চোখ বুলিয়েই স্তূপাকার কাগজের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায় না, টেবিলের একপাশে থাকে—অবসর বিনোদনের পক্ষে মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। ফুরিয়ে গিয়েও যেন ফুরোতে চায় না।

মণিশঙ্করকে বুঝতে অনুরাধার খুব বেশী দেরী হল না! কিন্তু তখন আর উপায় নেই।...

॥ চৌদ্দ ॥

শ্রেণীবদ্ধ তাল আর সুপারি গাছের সার পেরিয়ে অনেকখানি ধানক্ষেত। ক্ষেতের মাঝখানে আঁকা-বাঁকা আল সরু হয়ে মিশে গেছে দূর দিগন্তে ঘন সন্নিবেশ বনভূমির প্রান্তে। একপাশে বউ-ডুবির খাল এ-গাঁয়ের মাটিকে জলসিক্ত করে এগিয়ে গেছে ও-গাঁয়ের তৃষ্ণা মেটাতে।

রতনপুরের পুরোনো পাইক কর্তার সিং সেলাম ঠুকে, মিনতি জানাল এইবার ঘরে ফিরে যাবার জন্য।

অনেক বেলা হয়ে গেছে, জামাই সাহেবের রোদের তাপে কষ্ট হচ্ছে। আর তাছাড়া সামনের ক্ষেত পেরিয়ে যে বন দেখা যায় ওটা রতনপুরের রাজাবাবুদের নয়, অন্য জমিদারের এলাকা। অবিশ্যি ওখানে শিকার করলে কেউ আপত্তি করতে আসবে না, কিন্তু দরকার কি পরের এলাকায় ঢুকে!

দু'টো মাত্র বেলে হাঁস, আর একটা বন-মুরগী শিকার করা হয়েছে। ঐ নিয়ে বাড়ী ফিরতে মণিশঙ্করের ইচ্ছে নেই। আরও শিকারের আশায় ধানক্ষেত পেরিয়ে এগিয়ে গেল বনের দিকে। সঙ্গে

কর্তারসিং আর রঘুয়া, একজনের হাতে বন্দুক, আর একজনের হাতে ঝুলছে রক্তাক্ত পাখী তিনটি।

এবার অনুরাধাকে নিয়ে রতনপুরে আসবার সময় মণিশঙ্কর হাত-মুখ মোছা তোয়ালের মত একটি মোসাহেবকেও সঙ্গে এনেছে। কি জানি, হাজার হোক নতুন যায়গা। ললিত সঙ্গে থাকলে সময় মত সব কিছুই হাতের কাছে এগিয়ে দিতে পারবে।

শিকার করতে বেরুবার সময় ললিত কাঁধে ঝুলিয়ে এনেছে ফ্লাস্ক ভর্তি তৃষ্ণা ও ক্লান্তি মেটাবার উপকরণ। ক্ষেত পার হয়ে বনে ঢোকবার সময় ললিত সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিল যে হুজুরের এবার তৃষ্ণা লাগা উচিত।

গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে মণিশঙ্কর বলে—এইজন্যই তোমায় এত ভালবাসি ললিত। তৃষ্ণা পেয়েছে আমি ভুলে গেলেও তুমি ঠিক স্মরণ করিয়ে দাও।

কৃতার্থ ললিত তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেস্ সামনে ধরে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে মণিশঙ্কর এগিয়ে চলে গভীর বনের মধ্যে।

খানিক দূর গিয়ে বনের যেন একটু ছেদ পড়েছে। বাঁশের ঝাড় আর বৈঁচির ঝোপ।

মণিশঙ্কর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাইকদের ইসারা করল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে। ললিতকে নিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল বৈঁচি ঝোপের দিকে।

কতগুলি নাম-না-জানা বুনো গাছের ঘন পাতা সোনালী লতার জাল জড়িয়ে আরও ঘন হয়ে উঠেছে; পাঁচিল-ঘেরা পরিখার মত তারই আড়ালে এসে দাঁড়াল মণিশঙ্কর আর ললিত।

একটি প্রৌঢ়া কচি বাঁশ আর কঞ্চি জড়ো করে শুকনো লতা দিয়ে বাঁধছে, আর তার পাশে বসে কুড়ি একুশ বছরের একটি মেয়ে

একমনে বৈঁচি ফলের মালা গাঁথছে। কচি বাঁশের ডগার মত গায়ের রঙ। আশ্চর্য দেহের বাঁধুনি। একি পাথরে খোদাই করা মূর্তি! কাগজের ওপর কাগজ চাপিয়ে জোরে চাপ দিয়ে যেমন পেপার-পাল্পের মূর্তি তৈরী হয়, মাংসের পর নিরেট মাংস চাপিয়ে যেন গড়ে উঠেছে এই বলিষ্ঠ, উচ্ছল-স্বাস্থ্য নারী মূর্তি!

বর্ষার ভরা নদীর মত দুকূল ব্যাপী যৌবনকে একখানি আধময়লা খাটো ডুরে সাড়ী দিয়ে গাছকোমর করে বেঁধে রেখেছে।

—আয় না লো টিয়া, বাঁশ কঞ্চি বেঁধে নি।

বৈঁচির মালা গাঁথতে গাঁথতে প্রৌঢ়ার দিকে মুখ ফেরায় টিয়া। ভুরু দুটি বেঁকে যায়, ডাগর চোখে কৃত্রিম রোষ। মুখ ভর্তি পান জিভ দিয়ে গালের একপাশে জড়ো করে রেখে রক্তিম রসপূর্ণ ঠোঁট একটুখানি উল্টে টিয়া জানায়—সে এখন পারবে না।

—তা পারবে কেনে? নাগরের লেগে বৈঁচির মালা গাঁথ।…একটু থেমে তার দেহের দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ়া বলেঃ কী গতর হইছে লা! সাতটা বাঘে টেনে ছিঁড়ে খেতে পারবে নি!

কথার ভঙ্গী দেখে খিল খিল করে হেসে ওঠে টিয়া। কোলের বৈঁচি ফলগুলি ছিট্‌কে পড়ে। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে সে ঘাসের ওপর।

নদ-নদীর ডুরে-কাটা সবুজ পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত যেন ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে।

তরঙ্গিত কালো চুল ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটি নিটোল পরিপুষ্ট বাহুমূলে। কচি কলাগাছের চারার ওপর যেন ঢেউ খেলে যাওয়া একরাশ শ্যামা-লতা।

মণিশঙ্করের চোখে আর পলক পড়ে না। দৃষ্টিতে ছিট্‌কে পড়ে সার্চ-লাইটের তীব্রতা।

টিয়া এবার উঠে পড়েছে। কোমর থেকে টেনে আঁচল বা'র করে বৈঁচির মালাটা সন্তর্পণে জড়িয়ে নেয়। তার পর প্রৌঢ়ার হাত থেকে বাঁশ-কঞ্চির বোঝাটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে দু'হাতে মাথায় তুলে নেয়। হাল্কা বোঝাটি ওর ওপর চাপিয়ে দিতে বলে। ওটা প্রৌঢ়া অনায়াসে নিতে পারবে জানায়। টিয়া শোনে না। তার ধমক খেয়ে বুড়ী ভড়কে যায়। গজ্ গজ্ করতে করতে ওটাও টিয়ার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে পথ চলতে সুরু করে।

টিয়া পথ চলে! না, পথ সচল হয়ে ওঠে টিয়ায় পায়ে পায়ে! সেকালের কাব্যে "গজেন্দ্রগামিনী" কথাটা পড়ে মণিশঙ্কর হাসত। মেয়েছেলের চলা আর হাতীর চলা! কচি বাঁশের বোঝা মাথায় নিয়ে এই নিটোল স্বাস্থ্যময়ী গ্রাম্য তরুণীর হেলে দুলে পথ চলা দেখে আজ মনে পড়ল সেই উপমাটি; কিন্তু হাসির পরিবর্তে মনে জাগল মুগ্ধ-বিস্ময়!

খানিকটা দূর অলক্ষিতে টিয়াকে অনুসরণ করে মণিশঙ্কর খালের ধারে এসে পড়ল।

আর এগুলে ওরা দেখে ফেলবে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

টিয়া আর বুড়ী ওই দিকেই যাচ্ছে।

কর্তার সিংকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল—ওটা কুসুমদিঘির বাগ্দী পাড়া। ডান দিকের যে বাড়ীটায় ওরা ঢুকল—ও হ'ল মোড়লবাড়ী। বাগ্দীদের সর্দার পেহ্লাদ মোড়ল।

ডান হাত বাড়িয়ে মণিশঙ্কর একবার বন্দুকটা চেয়ে নিল।

বন্দুকটা নাড়াচাড়া করতে করতে কী যেন ভাবল। তারপর কর্তার সিংএর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল:

—থাক্, বাড়ী চল। শিকার আজ নয়; আর একদিন।

॥ পনের ॥

সন্ধ্যার পর দেওয়ান গোলোকনাথকে ডেকে পাঠাল মণিশঙ্কর।

কর্তার সিং ফিরে এসে চুপিচুপি দেওয়ানজিকে সমস্ত কথা জানিয়েছে। শুনে অবধি দারুণ দুশ্চিন্তায় গোলোকনাথ অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। মণিশঙ্কর ডেকে পাঠাতে তাড়াতাড়ি তার বসবার ঘরে ঢুকলেন।

মণিশঙ্কর আলোটা একখানা বই দিয়ে আড়াল করে ঈষৎ অন্ধকারে ইতঃমধ্যে অনেকগুলি পেগ শেষ করে ফেলেছে! গলার আওয়াজে জড়িমা এসেছে।

দেওয়ানজিকে আঙ্গুল দিয়ে একখানা কৌচ দেখিয়ে বসবার ইঙ্গিত করে, দেশলাইএর বাক্সে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে জিজ্ঞাসা করল ঃ

—কুসুমদিঘির জমিদার কারা বলুন তো?

—সীতারামগঞ্জের চক্কোত্তি বাবুরা।

—কালই লোক পাঠিয়ে তাদের খবর দিন যে কুসুমদিঘি আমি কিনতে চাই।···মণিশঙ্কর সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। এবং সেই অবসরে একবার গোলোকনাথের স্তব্ধ দৃষ্টির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল।

—কুসুমদিঘি কিনবে! লাভ কী হবে?···ওখানে শুধু দরিদ্র হাড়ী-বাগ্দীদের বাস।

মণিশঙ্কর দেহটাকে কৌচের ওপর একটু এলিয়ে দেবার ভঙ্গীতে কাৎ হয়ে বসল। আর একটান ধোঁয়া ছেড়ে, পায়ের ওপর পা রেখে দোলা দিয়ে বলল ঃ

—আপনার বয়স হয়েছে, তাই চোখের দৃষ্টিও হয়তো ঘোলা হয়ে আসছে। আপনি না জানলেও আমি জানি ওখানে মানিক আছে। কুসুমদিঘির মানিক! কর্তার সিংএর মুখে শোনবার পর থেকে যে

প্রসঙ্গটা কেমন করে তোলা যায় ভেবে গোলোকনাথ বুকের মধ্যে একটা কাঁটার খোঁচা অনুভব করছিলেন আপনা হতেই সেই প্রসঙ্গ এসে পড়েছে! ব্যাপারটা আর অধিকদূর অগ্রসর হতে না দিয়ে আজই শেষ করে দেওয়া ভাল। নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললেন :

—হুঁ! তা হলে, যা শুনেছি তাই?

—কী শুনেছেন? সোজা হয়ে উঠে বসে মণিশঙ্কর।

তার দৃষ্টির ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে গোলোকনাথ জিজ্ঞাসা করেন :

—সাপের মাথায় মানিক জ্বললে মানুষের কী?

—যে মানুষ সাপকে শায়েস্তা করতে পারে, সে মানিক হয় তার।

—কিন্তু এ যে-সে সাপ নয়। তাই এখনো বলছি—হুঁসিয়ার। প্রহ্লাদ বাগ্দী বিষাক্ত গোখরো সাপ।

চম্‌কে ওঠে মণিশঙ্কর!

—প্রহ্লাদ বাগ্দী! কে আপনাকে বলেছে তার কথা?

—যে-ই বলুক। আমি তোমায় একাজ করতে দেব না।...আজ আর নয়, একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো।...গোলোকনাথ উঠে যাচ্ছিলেন। মণিশঙ্কর তাঁকে বাধা দিল :

—শুনুন। যদি সবই জেনে থাকেন তা হ'লে এ কথাও জেনে রাখুন আমার কথার কোনোদিন নড়চড় হয় না। এবং এ ক্ষেত্রেও হবে না। মিছিমিছি বাধা দেবার কোন চেষ্টা করবেন না আপনি।

—কিন্তু আমারও যে একটা দায়িত্ব রয়েছে।

—কি দায়িত্ব?

গোলোকনাথ দাঁড়িয়েছিলেন। আবার বসে পড়েন।

—তুমি জানো না বাবাজি! তোমার শ্বশুর শ্রীপতি চৌধুরী মশাই মরবার সময় অনুরাধাকে আমারই হাতে তুলে দিয়ে যান। অনুরাধার শুভাশুভ—

—অনুরাধার শুভাশুভ নিয়ে আপনাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। তার অভিভাবক হবার সুযোগ পেয়ে এতদিন ধরে তার ওপর যে অন্যায় জুলুম করে এসেছেন আজ আর তা খাটবে না গোলোকবাবু!

আকস্মিক আঘাতে বৃদ্ধ গোলোকনাথের কণ্ঠস্বর প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসে ঃ

—আমি অনুরাধার ওপর অন্যায় জুলুম করেছি!

—বেশ তো! খাতাপত্তর শিগগিরই দেখছি—তখনই বোঝা যাবে।

রুখে দাঁড়ালেন গোলোকনাথ ঃ

—কার সাধ্য যে গোলোক ভট্চাযের হুকুম না পেলে দপ্তরখানার দরজা খোলে। তুমি কি ভেবেছ মণিশঙ্কর—

—থামুন! অনেক বয়স হয়েছে আপনার, আশা করি এটুকুন কাণ্ডজ্ঞান জন্মেছে যে যার হাত থেকে মাসে মাসে মাইনে গুণে নিলে, তবে আপনার উনুনে হাঁড়ী চড়বে—তার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙান —তাকে নাম ধরে ডাকাটা ধৃষ্টতা! তাকে বলতে হয় হুজুর। বলতে হয় কুমারবাহাদুর।

—হুজুর কিম্বা কুমারবাহাদুর বলতে পারে শেখরডিহির প্রজারা রতনপুর ষ্টেটের দেওয়ানজী নন্।…

গলার আওয়াজে চমকে উঠে মুখ ফেরাল মণিশঙ্কর।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অনুরাধা, মাথায় ঘোমটা খুলে পড়েছে! অসহ উত্তেজনায় মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, চোখের কোণে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে।

চমকে উঠে মাথা নীচু করে অলক্ষিতে সরে পড়লেন গোলোকনাথ।

—শেখরডিহির জমিদারের রতনপুরে এসে এ বাহাদুরি না দেখালেও চলত।

—কিন্তু গোলোকনাথবাবু আমাকে—

—উনি আমার কাকাবাবু। প্রণম্য ব্যক্তির নাম ধরে ডাকতে নেই—

এই সাধারণ রীতিটা শেখরডিহির জমিদার ভুলে না গেলেই খুসি হব।

অনুরাধা চলে যাচ্ছিল। টেবিলের পাশে রাখা হুইস্কির বোতল ও গ্লাস চোখে পড়তে আর একবার ফিরে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ, আর এক কথা, প্রণম্য ব্যক্তির কথা না হয় বাদ দিলুম, বয়সে যাঁরা বড় তাঁদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলবার সময় ঐ গুলোকে দূরে সরিয়ে রাখাই এ দেশের সাধারণ ভদ্রতা এবং রীতি। শেখরডিহি জায়গাটা বিলেত কি আমেরিকায় তা সেখানকার জমিদার বলতে পারেন—তবে আমাদের এই রতনপুরটা কিন্তু বাংলা দেশেরই একটি গ্রাম।

পর্দা ফেলে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অনুরাধা।

বাইরে এসে বারান্দার রেলিংএ দেহভার রেখে দাঁড়ালো। রাগে, অভিমানে, উত্তেজনায় তার দেহের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। খোলা হাওয়ায় সে বড় বড় নিশ্বাস নিতে লাগল।

বারান্দার এক প্রান্তে তার বাবার বসবার ঘর! ও ঘরটি আজকাল বন্ধ থাকে। সন্ধ্যার সময় খানিকক্ষণ খোলা রাখা হয়—প্রদীপ আর ধূপ জ্বেলে দেবার জন্য।

কুণ্ডলিত ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে দীপের শিখার কম্পমান ক্ষীণ রশ্মি বারান্দায় এসে পড়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন একটি মনুষ্য মূর্তি ধূপ এবং দীপের মত নিজেকে নিঃশেষে পুড়িয়ে দীর্ঘ ছায়া সঞ্চার করেছে।

কার ঐ ছায়ামূর্তি!

পরম বিস্ময়ে অনুরাধা এগিয়ে গেল অতি সন্তর্পণে সেই ছায়া লক্ষ্য করে।

ঘরের দেওয়ালে চৌধুরী মশাইএর প্রকাণ্ড একখানি তৈলচিত্র। হাতীর দাঁত এবং সোণার জলের কাজ করা অত্যন্ত দামী চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো। একপাশে পিলসুজে ঘিএর প্রদীপ জ্বলছে, অন্যদিকে ধূপদানীতে ধূপের ধোঁয়া উঠছে। ধূপ, গুগগুল ও কস্তুরি গন্ধ মিশিয়ে ঘরের হাওয়া বেশ ভারী হয়ে উঠেছে।

সেই আলোছায়া এবং গন্ধ-সমাচ্ছন্ন ঘরটিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'টি আজন্ম বন্ধু; গোলোকনাথ ও শ্রীপতি চৌধুরী।

একজন কায়ারূপে আর একজন ছায়ারূপে।

মাথাটা পেছন দিকে ঈষৎ হেলিয়ে গোলোকনাথ এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন প্রতিকৃতির পানে। কোটরগত চক্ষু জলভারে টলমল করছে, নিঃসাড়ে দুটি শীর্ণ গণ্ড বেয়ে ধারায় ধারায় নামছে! প্রতিমূর্তির চোখেও জল বুঝি চক্‌চক্‌ করছে। অনেক চেষ্টা করেও অনুরাধা ঠিক বুঝতে পারে না। দু'চোখ তার ঝাপ্‌সা হয়ে আসে; দরজার বাইরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা চাপা কান্না থেকে থেকে গলার মধ্যে গুমরে ওঠে।

—মা মণি গো!

গোলোকনাথ কখন এসে সস্নেহে তার মাথায় একখানি হাত রেখেছেন। আরও খানিকটা সময় দুজনের মুখে কথা নেই। দুজনেরই দৃষ্টি দূর আকাশে নিবদ্ধ।...আস্তে আস্তে সুরু করেন গোলোকনাথ।

—একটা কথা ভাবছি মা! অনেক দিন ধরেই তোমায় বলব ভাবছি, হয়ে ওঠে না।

অনুরাধা তাঁর দিকে চোখ ফেরাল এবার।

—দেহটা ভাল যাচ্ছে না। বিষয় কর্মের ঝঞ্ঝাট নিয়ে আর পেরে উঠছি না। কিছুদিন তোমরা আমায় ছুটি দাও মা।

—ছুটি !

—কোনো তীর্থে গিয়ে দেখি ; যদি এই শেষ ক'দিন একটু শান্তি পাই।

অনুরাধা বুঝল মণিশঙ্করের কাছে নিদারুণ অপমানে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, কাকাবাবু তারও ওপর অভিমান করেছেন।

অনুরাধা একদিন দীপঙ্করকে পথ ছেড়ে দিয়ে বলেছিল—যে যেতে চায় তাকে জোর করে ধরে রাখব না আমি। আঘাতে আঘাতে অনুরাধা ভেঙে পড়েছে, কিন্তু আজও তার সেই দুর্জয় অভিমান নিঃশেষ হয়নি।

—বেশ! যেতে চান, যান আপনি। দাদা চলে গেছেন, তা সহ্য করেছি। আপনি যে চলে যাবেন সে তো জানা কথা। জেনে শুনে সেটুকু সইতে পারব না ?

ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন গোলোকনাথ ঃ

—আমি যাবো, সে তোমার জানা কথা !

—হাঁ, দাদা যে বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে চলে গেছে—সে বিষয়কে অনেক দিন ধরেই আপনার বিষ বলে মনে হচ্ছে।

—না, না, এ তোমার অন্যায় সন্দেহ মা ! দীপু চলে গেছে বলে রাগ করে তোমার বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনার ভার ছেড়ে দিচ্ছি এ কথা তুমি কেমন করে বলতে পারলে মা ? তুমি তো জানো না মা, দীপু আমার কে ?

—কে আবার ? আপনি আর বাবা তাকে পালন করেছিলেন—

—তোমার বাবা তাকে পালন করেছিলেন সত্য। কিন্তু আমি তো তাকে শুধু পালন করিনি ! সে যে আমার—মনের আবেগে অনেকখানি বলে ফেলে একবার থেমে যান্ গোলোকনাথ। বলবার ভাষা যেন খুঁজে পান না !

বিস্মিত অনুরাধা জিজ্ঞাসা করে ঃ

—থামলেন কেন কাকাবাবু ! বলুন ? দাদা আপনার কে ?

মনের মণিকোঠা থেকে বেরিয়ে আসে অতি মৃদু, অতি গোপনীয় একটি কথা ঃ

—আমার বুক জোড়া নিধি—আমার সন্তান !

—দাদা আপনার সন্তান !

অপরিসীম বিস্ময়ে অনুরাধার যেন বাক্‌রোধ হয়ে আসে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে কথাটার মানে বোঝবার চেষ্টা করে যেন। তারপর বলে ঃ

—কিন্তু বাবা তো আমাকে এ কথা বলেন নি !

আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন গোলোকনাথ ঃ

—তোমার বাবা ছিলেন স্বর্গের দেবতা ! দীপু আমার সন্তান এ পরিচয় জানলে—পাছে কখনও তোমার মনে হয় যে তোমার স্বার্থের চেয়ে দীপুর স্বার্থটা আমি বড় করে দেখছি, তাই তিনি তোমায় জানান্ নি।

হঠাৎ তার মনে পড়ল চৌধুরী মশাই বলেছিলেন, "অধিক কিছু বলবার প্রয়োজন হলে, একজন রইলেন, তিনিই বলবেন !" সেদিনকার সে কথার অর্থ অনুরাধার কাছে এবার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এল !

কিন্তু এই মানুষটি কি অদ্ভুত ! অনুরাধার শত অপরাধ, শত উপদ্রব তিনি হাসিমুখে ক্ষমা করেছেন। নিজের সন্তানকে বুভুক্ষু রেখে অন্তরের সমস্ত স্নেহ ও কল্যাণ কামনা নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন অনুরাধাকে !

—দাদা আপনার সন্তান ! আর আপনি তাকে এমন করে চলে যেতে দিলেন কাকাবাবু ?

—শুধু তোরই মুখ চেয়ে মা, তোরই মুখ চেয়ে !

—আমার জন্য যদি আপনি দাদার অভাবও সহ্য করতে পারলেন, তবে

জগতে এমন কি আঘাত আছে কাকাবাবু, যা সইতে না পেরে আজ আপনি আমাকে অকূলে ভাসিয়ে চলে যেতে চাইছেন!

গোলোকনাথের গলা জড়িয়ে ধরে, বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে অনুরাধা।

—ঠিক বলেছিস মা! যে যত বড় অপমানই করুক—তা বলে তোকে তো আমি ত্যাগ করতে পারি না। তুই যে আমার মা।

গোলোকনাথের চোখের বড় .বড় জলের ফোঁটা আশীর্বাদের মত ঝরে পড়ে অনুরাধার মাথার ওপর।

॥ ষোল ॥

কলসি কাঁখে টিয়া স্নান করতে যায়। সঙ্গে এসেছে দেবনাথ।

আজকাল টিয়া একা স্নানের ঘাটে আসে না। দু'এক দিন পেহ্লাদ মোড়লের বউ, টিয়ার দিদিমা সঙ্গে আসে।

বুড়ীকে টিয়া বলেঃ

—তুমি ক্যানে? কত কাজ তুমার। বিন্দি, বাতাসী, উয়াদের একজনকে ডেকে লিব'খন।

বুড়ীকে ফাঁকি দিয়ে বিন্দি, বাতাসীকে না ডেকে একাই পথ চলে। পথের ধারে তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে দেবনাথ। টিয়া মনকে চোখ ঠারে···একজন জোয়ান মরদ্ সঙ্গে রইল—ভালই তো! ভয়টা কিসের?

ভয়ের কারণ ঘটেছিল কিছুদিন আগে, টিয়া যখন একা একা বউ-ডুবির খালে স্নান করতে যেত।

স্নান করে ভিজে কাপড়ে সে বাড়ী ফিরছিল। ডান দিকের ওই ঝোঁপটার কাছাকাছি যেতেই তার বুকের ওপর কি যেন একটা ছিট্‌কে এসে পড়ল। ডেলা পাঁকানো একখানা দশ টাকার নোট। ঝোঁপের ভেতর দাঁড়িয়ে সাহেবী পোষাকপরা একটি লোক তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। দেখে টিয়ার সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠল। তাড়াতাড়ি ভিজে গামছাখানা বুকের ওপর টেনে দিল। মাটিতে গড়িয়ে পড়া ডেলা পাকানো নোটখানাকে বলের মত পায়ের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সে হন্ হন্ করে বাড়ী চলে এলো। পেছনে শুনল খট্‌খট্ ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। তার দিকেই আসছে নাকি? একমুহূর্ত্ত থেমে টিয়া পেছনে তাকাল! নাঃ, ঘোড়া হাঁকিয়ে লোকটা রতনপুরের দিকে চলে যাচ্ছে।

···কথাটা টিয়া বলল বুড়ীকে।

বুড়ী বলল বুড়োকে।

বুড়োর কাছে শুনল সমস্ত বাগ্দীপাড়া!

নতুন জমিদার, সীতারামগঞ্জের চক্কোত্তিবাবুদের কাছ থেকে এই মাসখানেক হল কুসুমদিঘি কিনেছে। কুসুমদিঘি কেনবার পর জমিদার মাঝে মাঝে এদিকটায় একা একা ঘোড়া হাঁকিয়ে আসে কেন—এইবার তার কারণ বোঝা যাচ্ছে!

আসুক আবার! বাগ্দীরা এবার হুঁশিয়ার।······

জমিদার হয়তো বুঝতে পেরেছে। তাই, আর সে এদিকটায় আসে না। তা না আসুক, সাবধানের মার্ নেই। টিয়ার একজন সঙ্গী দরকার। সঙ্গী দিদিমা নয়, বাতাসী, বিন্দি নয়,···দেবনাথ।

নওজোয়ান দেবনাথ। বিশ্বকর্ম্মার কামারশালে যেন ঢালাই করা ইস্পাতে গড়া দেহ।

বাতাসী বিন্দি বলেঃ লোহার কার্তিক।

টিয়া রাগ করে বলেঃ চোখে তোদের ছানি পড়ুক। লোহার কার্তিক হবে ক্যানে?···দেবনাথের বাব্‌রি চুলে মাছরাঙার পালক গুঁজে দিয়ে সোহাগ করে ডাকেঃ কালোসোনা, আমার কেলে বঁধূ।

স্নান করতে এসে ঘাট ছেড়ে তারা আঘাটায় চলে যায়।···প্রায় তিন-চার রশি দূরে। ওই যেখানে খালের ধারে কদম গাছে ফুল ফুটেছে; শাদা কেশর ঝুরে পড়েছে গাঙের নরম মাটিতে।

দেবনাথ বাঁশি বাজায়, তার নিজের হাতে তৈরী করা বাঁশি। টিয়া তার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে বসে বাঁশি শোনে।

—বড় মিঠা সুর বন্ধু! অমন মিঠা বাঁশি বাজাও কেমুনে?

—আয়, তোরে শিখাইয়ে দি।

দেবনাথ ঘুরে বসে। টিয়ার কাঁধের ওপর দিয়ে দু' হাত বাড়িয়ে তার আঙ্গুলগুলো বাঁশির রন্ধ্রে টিপে ধরে।

টিয়াকে বাঁশি বাজাতে সে শেখাবেই।

টিয়া ফিক্ করে হেসে, তার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নেয়। ফিস্‌ফিস্ করে বলেঃ

—যদি কেউ দেইখ্যে ফ্যালে?

—দেখুক না। গাঙ হইল কালিন্দী, গাছটা তো কদম্ব···ঠিকই। উয়ারা বুলিবে—ইখানে রাধা কেষ্ট উদয় হইছেন।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে টিয়া।

সেই সশব্দ হাসি—যে হাসিকে বুড়ী বলে 'সব্বনাশা হাসি।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে টিয়া উঠে বসে। শাড়ীর আঁচর ভাল করে গায়ে জড়াতে জড়াতে বলেঃ

—তুই ইখানে আর আসিস্ নে দেবা।

—ক্যানে ?

—ক্যানে ?

ভেংচী কেটে বলে টিয়া ঃ

—তুর্ মুরদ্ খুউব বুঝে নি'ছি।

দেবনাথের দেহের রক্ত টগবগ করে ওঠে। কাজল আর সিঁদূর মাখানো রঙের মত একটি বর্ণোচ্ছ্বাস খেলে যায় তার সুগঠিত কালো দেহের ওপর। মুরদ্ তার আছে কি নেই এখনি সে তার তেল-পাকানো লাঠির ঘায়ে দশ বিশটা লেঠেলকে বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আর কেউ নয় তার ওস্তাদ, প্রহ্লাদ মোড়লের সঙ্গে লাঠি খেলতে হবে যে!

প্রহ্লাদ টিয়ার বিয়েতে পণ চায় না, জমিজমা চায় না, গহনা কিচ্ছু চায় না! দেবনাথকে ডেকে সে স্পষ্ট কথা বলে দিয়েছে ঃ

—আমার লাতিনকে লিবি তো লাঠিবাজী করে লিতে হবে।

অত বড় ডাক সাইটে মোড়লের নাতিন্—তাকে কি যে-সে লোক বিয়ে করতে পারে ? প্রহ্লাদের সঙ্গে লাঠি খেলে জিততে পারলে —তবে টিয়া হবে তার বউ।

দেবনাথ প্রত্যহ খেলা অভ্যাস করে। আরো পাঁচ ছ' মাস পরে নৌকা 'বাইচে'র সময় সে ঠিক করেছে—লাঠি ধরবে, সর্দারের সঙ্গে তার শাকরেদীর পরখ দিতে।

—ভাবছিস্ কী ? তুই আর লাঠি ধরতে পারবিক্ নি! তুর্ হাতে বাঁশ আজ বাঁশী হইছ্যে রে।

ক্ষেপে ওঠে দেবনাথ। টিয়ার চুলের মুঠি ধরতে হাত বাড়ায়।

পিঁছলে পালিয়ে যায় টিয়া।
জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঝুপ করে ডুব দেয়।
অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে। তারপর মাঝ গাঙে গিয়ে এক সময় ভেসে ওঠে।
দেবনাথ একটা কদম ফুল ছুঁড়ে মারে তার মাথা লক্ষ্য করে।
আওয়াজ হয় 'টুপ্!' টিয়া আবার ডুব দেয়। আবার ওঠে।
দেবনাথ ফুল ছোঁড়ে! পানকৌড়ির মত মেয়েটা দেবনাথকে নাস্তানাবুদ্ করে তুলেছে।

—লাতিন্ রে! কম্‌নে গেলি! বুলি ও টিয়া।
দূর থেকে হাঁক দেয় প্রহ্লাদ মোড়ল। দেরী দেখে খুঁজতে এসেছে বোধহয়।
—যাই—দাদু-উ-উ।
টিয়া চোখ ইসারায় দেবনাথকে বলে—পালাও। দেবনাথ গা ঢাকা দেয়। টিয়া কলসিতে জল ভরে উঠে পড়ে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে ভিজে শাড়ী পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এক হাতে শাড়ী সামলে কোন রকমে উঠে আসে।

'লাজ-রক্ত হইল কন্যা পরথম্ যোবনে।'

দেবনাথ চলে যায় নি!
ঐ যে ঝোপটার পাশে দাঁড়িয়ে। বেহায়া পুরুষ!
সেবার বাসুদেবপুরের মেলায় টপ্পা আর ঝুমুরের দল এসেছিল। তাদের গাওয়া ক'খানি আদি রসের গানের ভাঙা কলি প্রায়ই দেবনাথের মুখে মুখে ফেরে!
দেবনাথের ছড়িয়ে ফেলা একটা কদম ফুল তুলে বোঁ করে ছুঁড়ে মারল টিয়া দেবনাথের মাথায়!

'শিহরে কদম্ব যেন শ্যাম পরশনে'—

দেবনাথ ছুঁড়ে মারল গানের কলি।

কোপন স্বভাবা নায়িকার মত টিয়া চোখ পাকিয়ে দেবনাথকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে হেলে দুলে এগিয়ে যায়।

কাঁখের কলসি বলে ঃ

ও রাগ নয়গো অনুরাগ! সব ছল্ চাতুরী! অর্থাৎ কিনা ছল্—ছল্—ছলাৎ।

বাড়ীর কাছাকাছি আসতে দেখা হ'ল পেহ্লাদ মোড়লের সঙ্গে।

—এত দেরী! আমরা বুড়ো বুড়ী ভেব্যে মরি! যা, তুর্ দিদি বাঁশের চুবড়ীর কাম কইরছ্যে, তুই ভাত ডাল রেঁধ্যে রাখ্। আমি মাটি কেট্যে উ বেলা আসব?

—মাটি কাটবা?

—হ্যাঁরে লাতিন্, দেব্তা কইছে, রাস্তা বান্ধা হবে।

কোদাল কাঁধে এগিয়ে যায় পেহ্লাদ মোড়ল।

দেব্তা। বাগ্দীদের দেব্তা দীপঙ্কর!

হরিদ্বার থেকে ফিরে সে উঠেছে এই বউ-ডুবির খালের ধারে বাগ্দী পাড়ায়। এই নির্যাতিত অবোলা জীবগুলির মুখে সে দেবে নূতন ভাষা, মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার দেবে এই রোগ, শোক, দারিদ্র ও অশিক্ষায় জর্জরিত অর্ধমৃতদের।

এখানে এসে দীপঙ্কর একটি অনাথ আশ্রম গড়ে তুলেছে। তার নাম দিয়েছে সে 'মান-মন্দির।' বাগ্দীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-চর্চা, রোগের চিকিৎসা সব কিছুর ব্যবস্থা করতে চায় সে তার মানমন্দিরে।

এত রকমের কাজ রয়েছে এখানে যে নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা ভাববার অবকাশ দূরে থাক—বিশ্রামের অবসর নেই। ভোর রাত থেকে আরম্ভ করে সেই দুপুর রাত পর্যন্ত—ছেলেমেয়ে পড়ান, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা, রাস্তাঘাট তৈরী করা, বাড়ী বাড়ী ঘুরে কাউকে ওষুধ-পথ্য দেওয়া, কাউকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া—কাজের যেন অন্ত নেই।

এত কাজ, একার পক্ষে অসম্ভব। দীপঙ্কর চিঠি লিখেছিল অমিতাকে। অমিতা চিঠি পেয়ে দু' হপ্তা হ'ল চলে এসেছে কুসুমদিঘিতে—দীপঙ্করের কাজের সঙ্গী হ'তে।

—জানেন অমিতা দেবী! সেদিন আপনাকে আসবার জন্য যখন চিঠি লিখি হরিদ্বারে, প্রহ্লাদ কী বলেছিল?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় অমিতা!

—প্রহ্লাদ ভাবলে হরিদ্বার—সে হ'ল মহাদেবের দেশ! ঠাকুর নিজে তো সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে ভোলানাথ হয়ে পড়ে থাকেন। তিনি নিজে না এসে হয়তো চিঠি পেয়ে—পার্বতী ঠাক্‌রুণকে পাঠিয়ে দেবেন। তাই আমাকে বললে প্রহ্লাদ—'ভাল করে বুঝিয়ে লেখ, ঠাকরুণ আসবার সময় যেন তাঁর সঙ্গে কৈলাস থেকে এমন সব ধানের বীজ নিয়ে আসেন, যা দিয়ে আমরা সম্বৎসর ভালো ভাবে অন্নপূর্ণা পূজো করতে পারি।'

অমিতা মুগ্ধ হয়ে শোনে।

—সত্যি, এত সরল এই মানুষগুলি।

সকালবেলা মান্‌কে এসে হাজির হয়েছে। ওর বউকে ওষুধ দিতে হবে। দীপঙ্কর জিজ্ঞাসা করল:

—বউ কেমন আছে রে মান্‌কে?

—ফির্ কাঁপুনি আসিল, ডাকিনী কাঁধে চাপিল, পেত্নী হইয়ে কি সব বিড়্‌বিড়্ মন্তর কহিল।

দীপঙ্কর একটু হেসে জবাব দেয়ঃ

—হ্যাঁ, ডাকিনীই বটে রে! ওর নাম ম্যালেরিয়া ডাকিনী।

মানিক সভয়ে ডাকিনীর উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম জানিয়ে—ইতস্ততঃ তাকিয়ে খাটো গলায় জিজ্ঞাসা করেঃ

—তা মালুরী ডাকিনীর কি দাওয়াই দেবতা!

—ওর কোনো দাওয়াই নেই। যতক্ষণ তোর্ বাড়ীর দক্ষিণ দিকের সেই পেত্নীর বাসাটা না ভেঙ্গে দিবি, ততক্ষণ ডাকিনীও তোর বউকে ছাড়বে না।

—হেঁই বাবা! একটু চুপ করে থেকে আবার সুধায়ঃ

—তা মালুরী ডাকিনীর আস্তানা কোন্‌টা হইল হে?

—কেন? তোর বাড়ীর দক্ষিণ দিকের সেই এঁদো পুকুরটা।

—সেইটি বটে!…তা তেনারে তো চক্ষে দেখিনি কখনো?

এবার জবাব দেয় অমিতাঃ

—দেখবে কি করে? পচা শ্যাওলা আর পাঁকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে! ঐগুলো ফেলে দিয়ে পুকুরটা পরিষ্কার করো। দেখবে, ডাকিনী পালাবে। আর তোমার বউও ভালো হয়ে যাবে।

মানিক ঘাড় নেড়ে বলেঃ

—তাই করিব। চন্নু দেব্‌তা, চন্নু মা-নক্ষী, পরণাম!

মানিক চলে যাবার একটু পরেই সেই দিকে কার যেন গান শোনা গেলঃ

কল্‌মী শাকের চিকণ ডগা তুলতেছিল পুঁটুরাণী
হরে কুলু তাই না দেখে ছুইট্যে এলো ফেলে ঘানি।

গলার আওয়াজ শুনেই দীপঙ্করের ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হল না। সে হাঁক দিয়ে ডাকলঃ

—চন্দোরা, এই চন্দোরা! শুনে যা শীগগির—

চন্দোরা বাগ্‌দীপাড়ার নিশাচর প্রাণী। মড়া পোড়াতে, রাত জেগে কলেরা রুগীর সেবা করতে ও অদ্বিতীয়। স্থলচর, জলচর এ হেন নেশার সামগ্রী নেই—যাতে চন্দোরা অনভ্যস্থ। দীপঙ্করের হাঁক শুনে টল্‌তে টল্‌তে এসে দাওয়ার ওপর বসে পড়ল।

দীপঙ্কর ধম্‌কে বলে ঃ

—এই চন্দোরা, তুই আবার মদ খেয়েছিস্‌?

জড়িত কণ্ঠে জবাব আসে ঃ

—খেয়েছি সে দোষের নয়; দোষ হ'ল ধরা পড়েছি। তার আর কী করব দেব্‌তা? তোমার ভয়ে ও পথে পালাচ্ছিনু। তা কি করে জানবো বল—তুমি কেষ্ট ঠাকুরের বিশ্বরূপ হয়ে এখানে বসেই আমায় দেখতে পাবে?

—আবার মাতলামি কচ্ছিস্‌? দাঁড়া, ডাকছি প্রহ্লাদকে!

চন্দোরা জিভ কামড়ে দু' কান মলে ঃ

—রক্ষে করো দেব্‌তা। সেদিন ঠেঙ্গিয়ে আমার হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে, আর ডেকো নি মোড়লকে।

—তবে দিব্যি কর, আর ও জিনিষ খাবি নে!

—কী করে খাব? তুমি কি খাবার উপায় রেখেছ? তোমার ফুস্‌-মন্তরে সব হাড়ী-বাগ্‌দী বোষ্টম হয়ে গেল, কোনো ব্যাটা আর সরাব তাড়ী খায় না।···বলেই চন্দোরা হঠাৎ হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ওঠে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে ঃ

—নিধে শুঁড়ী বললে কাল সকালে দোকান তুলে নিয়ে ভিন্ গাঁয়ে চলে যাবে। তাই তো আজ একটু জন্মের শোধ শেষ খাওয়া খেয়ে নিলুম।

একটু থেমে চোখ রগড়ে নিল ঃ

—ওঃ, মনের দুঃখে বড্ড খেয়েছি। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লেগেছে!

দীপঙ্করের মনটা নরম হয়ে আসে।

—এত শরীরের কষ্ট হয়, তবু কেন ও বিষ খাস্ বল্‌তো?

—খাই সাধে? ও বিষ যে আমাদের রক্তে মিশে আছে দেব্‌তা!…

একটু সোজা হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করে চন্দোরা। বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলতে আরম্ভ করেঃ

—শোনো দেব্‌তা। আমার পিতে ঠাকুরের শুনেছি, রোজ এক ভরি কালো মানিক লাগতো! আর ঠাকুরদা মশাইএর শুনেছি ওতেও শানাতো না। তাঁর নাকি পোষা সাপ ছিল। সাপের জিভের কাছে জিভ এগিয়ে দিতেন। সেই ছোবল্ খেয়ে সারা রাত নেশায় বুঁদ্ হয়ে থাক্‌তেন। আবার সকালে উঠে দিব্যি কাজ কম্ম করতেন।

কথা শুনে একসঙ্গে শিউরে ওঠে দীপঙ্কর, অমিতা!

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে অমিতাঃ

—বলো কি চন্দোর্!

মাথা দুলিয়ে জবাব দেয় চন্দোরাঃ

—ঠিকই বল্‌ছি দিদি ঠা'রোণ। এখন আমাদের সাপে কামড়ালে আমরা মরে যাই। আর তাঁদের গায়ে ছো!বল মারলে—সেই মৃত্যুঞ্জয় কালপুরুষদের বিষের জ্বালায়—সাপই যেত অক্কা পেয়ে! বুঝেছ দিদি ঠা'রোণ, সাপই যেত অক্কা পেয়ে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে দীপঙ্কর অমিতা পরস্পরের মুখের পানে তাকায়।

চন্দোরা টলতে টলতে নেমে যায়—বড় তেঁতুল গাছটার ওপাশে বনের আড়ালে মিলিয়ে যায়। মৃত্যুঞ্জয় কালপুরুষদের বংশধর। রক্তে তার অতৃপ্ত তৃষ্ণা। নিধে শুঁড়ী দোকান-পাট হয়তো এখনো গুটোয় নি।…

॥ সতের ॥

অনুরাধা শেষ পর্যন্ত স্থির করেছে সে হরিদ্বার যাবে! সঙ্গে থাকবে বুড়ী ঝি রতুর মা। পুরোনো কর্মচারী রামশরণ বাবু তাদের পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

দীপঙ্কর যে অমিতাদের সঙ্গে গেছে এটা আন্দাজ করেই নিয়েছিল। পরে খোঁজ খবর করে হরিদ্বার আশ্রমের ঠিকানা সে যোগাড় করে নিয়েছে। ওখানে দাদা আছে, অমিতা আছে—কিছুদিন ওদের কাছে থেকে আসবে। দেহ মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। কিছু দিন ঘুরে এলে হয়তো একটু সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে।

সেদিন গোলোকনাথ খবর নিয়ে এলেন—দীপঙ্কর, অমিতা হরিদ্বারে নেই। তারা কুসুমদিঘির বাগ্দীপাড়ায় অনাথ আশ্রম তৈরী করে সেখানেই রয়েছে। রতনপুরের পাইক কর্তার সিং নিজের চোখে দেখে এসেছে—দীপঙ্কর কোদাল ধরে বাগ্দীদের সঙ্গে মাটি কেটে রাস্তা তৈরী করছে।

এতদিনের মধ্যে দীপঙ্কর অনুরাধাকে একখানি চিঠি লেখেনি। বাড়ীর পাশে কুসুমদিঘিতে এসেছে তবু একটিবার দেখা করা দূরে থাক্—খবরটুকুও দেয়নি। একবার ইচ্ছে হ'ল ছুটে গিয়ে দাদার দু'খানি হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসে। গলা জড়িয়ে ধরে বলেঃ আমি আর সইতে পারি না দাদা। এমন করে তোমরা আমায় তিলে তিলে দগ্ধে মের না।...আবার ভাবেঃ না, থাক্। দাদার অভিমানটাই বড় হবে! নিঃশেষে ধূপের মত নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে সে দাদার ওপর প্রতিশোধ নেবে।...গোলোকনাথকে সে জানাল তার হরিদ্বার যাবার সঙ্কল্প স্থির আছে। দাদা হরিদ্বারে

না থাকলেও মাস্টার মশাই আছেন। তাঁর আশ্রমে তাঁর কাছেই সে দিন কতক থাকবে!

—কিন্তু মা, অন্য একটি বিষয় ভাববার আছে।

গোলোকনাথের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকায় অনুরাধা।

—খবর যা শুনলুম, ও অঞ্চলের হাড়ী বাগ্দীদের দুঃখ দুর্দশা দূর করাই এখন দীপুর জীবনের ব্রত। ওরাও দীপুকে দেবতার মত মানে। তুমি তো জানো মা, বাগ্দীদের ওপর নানারকম জুলুম করবার জন্যই মণিশঙ্কর কুসুমদিঘি কিনেছে। তাই ভাবছি—একদিন হয়তো দীপু আর মণিশঙ্করের মধ্যে—

কথাটা শেষ না করে গোলোকনাথ অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব প্রত্যাশায় চুপ করে রইলেন।

—আমি বুঝতে পেরেছি কাকাবাবু—অনেকটা সহজভাবে বলে অনুরাধা ঃ

—ওদের দু'জনের মধ্যে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য।

সায় দিয়ে বলেন গোলোকনাথ ঃ

—নিশ্চয়ই। সে সময় ওদের থামাতে তোমার এখানে থাকা দরকার।

—না কাকাবাবু, সে'টা ঘটবার আগেই আমি এখান থেকে সরে যেতে চাইছি!

কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না গোলোকনাথ। হেঁয়ালী বলে মনে হ'ল।

অনুরাধা আরো স্পষ্ট করে বলে ঃ

—দুর্বলতার বশে আমি যদি কখনো আমার স্বামীর হয়ে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, আমায় দেখে দাদা কর্তব্যচ্যুত হবে, তার ব্রত ভঙ্গ হবে—সে আমি করতে চাই না কাকাবাবু। আমি তার চলার পথে কাঁটা হয়ে থাকব না। আমি দূরে সরে যাবো।...আমার

যাবার সব ব্যবস্থাই ঠিক আছে। আপনি শুধু পাঁজি দেখে যাবার দিনটি স্থির করে দিন।

গোলোকনাথ অনুরাধাকে ভাল করেই জানেন। আর প্রতিবাদ না করে পাঁজি দেখতে উঠে পড়লেন।

মণিশঙ্করের বিষয়ে অনুরাধা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করে দেখেছে—তাকে ফেরান অসম্ভব। অনুরাধা আজ স্থান পেয়েছে পুরোনো ছেঁড়া খবরের কাগজের স্তূপে! অনেকটা জঞ্জালের মত। তাকে আর কোনো প্রয়োজন নেই মণিশঙ্করের।…যে অবস্থায় মেয়েদের সারা দেহে একটা তীব্র আনন্দের অনুভূতি তড়িৎ শিখার মত খেলে যায়, থেকে থেকে চমকে ওঠে—বুঝি অনাগত দেবদূতের পদধ্বনি শোনবার জন্য—অনুরাধার কাছে আজ সেই অবস্থাটিই যেন বিধাতার এক নিষ্ঠুর অভিশাপ!

রক্তে রক্তে রিণিঝিণি বাজে! সে বলেঃ আমি এসেছি। স্পষ্ট বুঝতে পারে অনুরাধা—দেহে, অন্তরে, শিরায়-শিরায়, প্রতি রক্ত কণিকায়।…সারা মুখে তার রক্তোচ্ছ্বাস জাগে, তারপর সহসা কাগজের মত একেবারে বিবর্ণ হ'য়ে যায়। কেন এল?…ও কেন এল?

…স্বপ্ন দেখে নদীর ধারে ছোট্ট ঘর! দাওয়ায় তার কোলে বসে খেলা করছে একটি খোকা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, গোল গোল মোমের পুতুলের মত হাত পা, তুলতুলে গাল, হাসলে টোল খায়, কাল কাজল চোখ দু'টির পানে তাকিয়ে বনের পাখীরাও যেন মায়ার ফাঁদে পড়ে; দাওয়ায় বসে শীষ দেয়। খোকা হাসে খল খল করে—সঙ্গে নদীতে ঢেউ বলে ওঠে কল্ কল্। খোকার মুখ কালো হয়, আকাশে মেঘের ছায়া পড়ে। খোকার চোখে আনন্দের ঝলক দেখে আকাশ ঝল্‌মল্ করে ওঠে সোনালী রোদে।…ঘুম ভেঙ্গে যায়!

দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্তস্বরে বলে অনুরাধা—কেন এলি! তুই কেন এলি!…

অনুরাধার সর্বদা আতঙ্ক আজকে যে আছে অঙ্কুরে—একদিন সে-ই হবে পরিণত বিষ-বৃক্ষ। শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবে, জ্ঞান হয়ে দেখবে চারিদিকে উদ্দাম প্রবৃত্তির লীলা। মণিশঙ্করের রক্ত তার ধমনীতে উচ্ছল হয়ে উঠবে। তার পর একদিন সেও যে মণিশঙ্করের মত কিম্বা তার চেয়েও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হবে না—তাই বা কে বলতে পারে?…

না, এই পরিবেশে অনুরাধা কিছুতেই তার অনাগত শিশুকে ভূমিষ্ঠ হতে দেবে না। পৃথিবীর আলোয় সে যদি সত্যিই একদিন চোখ মেলে তাকায়—সে যেন পায় মুক্ত আকাশের আলো, সে যেন পারে মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস নিতে। সবার দৃষ্টির আড়ালে হিমালয়ের উদার আকাশের নীচে তপোবন-তরুটির মত সে পালন করবে—তার অনাগত সন্তানকে।…আর দেরী নয়, প্রাণীমাত্র তার সম্ভাব্য-মাতৃত্বের বিষয় জানবার আগে সে চলে যাবে হরিদ্বারে মাষ্টার মশাইএর কাছে।

যাত্রার সময় হয়েছে। মালপত্তর সব নৌকোয় উঠেছে।

অনুরাধা গোলোকনাথকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল ঃ

—আসি কাকাবাবু।

গোলোকনাথ কোন কথা বলতে পারলেন না। বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত রাখলেন শুধু।

হঠাৎ অনুরাধা চমকে উঠল ঃ

—ও কিসের গোলমাল! কাছারী বাড়ীর ওই দিকটা থেকেই না?

—হাঁ, তাই তো? কি হ'ল?—গোলোকনাথ সেই দিকে তাকালেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল বামদেব ; গোলোকনাথের চাকর।
অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল ঃ
—কি হয়েছে বামদেব ?
বামদেব ঘটনাটা যা শুনেছে তাই বলল ঃ
—বাগ্দীদের মেয়েরা সাধুগঞ্জের হাটে চুব্ড়ী বেচতে যাচ্ছিল। জামাই সাহেবের হুকুমে পথের মাঝখানে পাইক-বরকন্দাজ লুকিয়ে ছিল। একটা মেয়েকে যেমনি পাইকেরা ধরেছে, অমনি কোথা থেকে বাগ্দীমোড়ল বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিল। মেয়েটা আর তার সঙ্গীরা সব ছুটে পালাল। পাইক-বরকন্দাজরা বেঁধে এনেছে বাগ্দী মোড়লকে!
—বাগ্দী মোড়ল! কুসুমদিঘির প্রহ্লাদ বাগ্দী! জিজ্ঞাসা করলেন গোলোকনাথ।
বামদেব জবাব দিল ঃ
—হ্যাঁ।
—আচ্ছা তুই যা। বামদেব চলে গেলে অসহায়ের মত অনুরাধার দিকে তাকালেন গোলোকনাথ।
—আমিও শুনেছি মা, ঐ প্রহ্লাদ বাগ্দীর নাতিনটির ওপর মণিশঙ্করের কুদৃষ্টি পড়েছে। বলতে গেলে এক রকম ওরই জন্যে কুসুমদিঘি কেনা। ওকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে এই সব কাণ্ড।...
একটু নিস্তব্ধ থেকে অনুরাধা বলল ঃ
—আপনি যেমন করে পারেন কাকাবাবু,—মেয়েটিকে রক্ষার ব্যবস্থা করুন। আমি আর দেরী করলে হয়তো সময়ে স্টেশনে পৌঁছুতে পারব না। আমি আসি তবে ?
—কিন্তু মা, বাধা দিয়ে বলেন গোলোকনাথ ঃ
একটি অসহায়া মেয়েকে এমন বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে তুমি চলে যাবে ?

ম্লান হাসি খেলে যায় অনুরাধার মুখে ঃ

—সে আর অসহায়া নয়। আমি জানি সবার চেয়ে যোগ্য লোকের হাতে আমি তার রক্ষার ভার দিয়ে যাচ্ছি।

—তবুও বলছিলাম—

—না, আর তবু নয়। আজ আমাকে যদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, আজকের এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হয়, তাহলে শুধু ওই মেয়েটিকে রক্ষা করলেই চলবে না। স্বামীকে তিরস্কার করলেও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

—তবে কি করতে হবে মা ?

—কি করতে হবে ? আমাকে দাঁড়িয়ে থেকে এ পাপের প্রতিবিধান করতে হলে, অসহায় পেয়ে মেয়েটির ওপর লোভ করে যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে তেমন কাজ করতে না পারে, তাই তেমন স্বামীর দু'খানা হাতই দু'টুক্‌রো করে কেটে নিয়ে ঐ চিতলমারীর বিলের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে !

একটু থেমে, একটু দম নিয়ে অনুরাধা আবার বলে ঃ

—কিন্তু দুর্বল মন নিয়ে সে কাজ যখন করতে পারব না, তখন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটির লাঞ্ছনাও সইতে পারব না। আপনি যান্ কাকাবাবু, তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করুন। মনে রাখবেন—সে আর কেউ নয়, বাগদীর মেয়ে সেজে আপনার অনু-ই আপনার কাছে আশ্রয় চাইছে।

নত হয়ে অনুরাধা আর একবার গোলোকনাথের পা দু'খানি স্পর্শ করল।

তাকে তুলে ধরে গোলোকনাথ বললেন ঃ

—তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, মেয়েটিকে আমি রক্ষা করব।···স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অনুরাধা গেল ঘাটের দিকে—যেখানে স্টেশনে যাবার জন্য নৌকো বাঁধা রয়েছে।

॥ আঠার ॥

কাছারী ঘরের পেছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি। সেখানে ভাঙ্গা পাঁচীলের ধারে একটা বটগাছ, গুঁড়িটা অনেককাল আগে বাঁধানো হয়েছিল, বৃষ্টির জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাঁজরা বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে গ্রীষ্মের দিনে তার শীতল ছায়ায় বসে হিন্দুস্থানী দরোয়ান সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে। জায়গাটা বেশ নির্জন।···সেইখানে বলির মহিষের মত প্রহ্লাদ বাগ্দীকে হাতে পায়ে কোমরে দড়ি বেঁধে হিন্দুস্থানী পাইকেরা লাঠি হাতে ঘিরে রয়েছে। প্রহ্লাদের কপাল কেটে থানা থানা রক্ত জমেছে, সাদা চুলের একধারে কে যেন একমুঠো ফাগ মেখে দিয়েছে। হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে মণিশঙ্কর, তার পাশে ললিত। মণিশঙ্কর পাইপটা দাঁতে চেপে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রহ্লাদের জবাবের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। টিয়া কোথায়? তাকে এনে দিতে হবে। প্রহ্লাদের এক জবাব—কিছুতেই টিয়াকে তোমরা পাবে না।

—তবে এই তোর শেষ কথা! জিজ্ঞাসা করে মণিশঙ্কর।

অসহ্য যাতনায় প্রহ্লাদের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। একটা ঝাকুনি দিয়ে সে উঠে বসল ঃ

—হাঁ, হাঁ, এই শেষ কথা হে! হুঁসিয়ার থাকিনি কিনা, তাই হাটের পথে মেয়েটাকে ধরেছিল, দূর থেকে দেইখ্যে ছুট্যে আইনু। হাতে লাঠি ছেল না, তাই তোমার ভোজপুরী পাইকরা আমার মাথা ফাটায়ে দিয়ে, আমায় ধইরে আনলো। লাঠিগাছটা হাতে পাইলে, প্রহ্লাদ বাগ্দী একবার দেখে লিত···তোমার ভোজপুরীরা কত বড় লেঠেল হে!

—তা দেখবার সুযোগ তুই পাবিনে প্রহ্লাদ। মণিশঙ্করের চোখেমুখে

একটা দুরন্ত উল্লাস খেলা করে।...তোকে আট্‌কে রেখে গোটা বাগদী-পাড়া আমি আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেব।

প্রহ্লাদ শিউরে ওঠে :

—আগুন জ্বালাবা? গোটা গাঁয়ে?

—হাঁ, বাগদীদের আমি পুড়িয়ে মারব।

প্রহ্লাদের ইস্পাতের মত দেহ একবার সোজা হয়ে ফুলে ওঠে। যেমন করে শৃঙ্খল ভাঙবার চেষ্টা করে লৌহকারার বন্দী-মানুষ।

—বেশ, পুড়িয়ে মার না কেনে! বাগদীরা জীবন দেবে, তবু তাদের মেয়ে ছেইল্যের ধম্ম দিবে না।

—আচ্ছা, দেখছি।

মণিশঙ্কর পাইকদের হুকুম দিল প্রহ্লাদকে চোরা কুঠরীতে নিয়ে আটকে রাখতে। সেখানে নিয়ে গিয়ে পা থেকে সুরু করে মাথা পর্যন্ত অবিরাম বেত্রদণ্ডের আদেশ হ'ল।

ত্রস্তপদে ছুটে এলেন গোলোকনাথ। মণিশঙ্করকে অনুরোধ করে বললেন :

—আমি তোমার পিতৃস্থানীয়। আমি তোমার কাছে হাতজোড় করে ভিক্ষে চাইছি তুমি ওকে ছেড়ে দাও বাবা!

মণিশঙ্কর সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না। পাইকদের হুকুম দিল প্রহ্লাদকে নিয়ে যেতে। গোলোকনাথ ইসারায় পাইকদের থামিয়ে দিলেন। মণিশঙ্করকে বললেন :

—একান্তই যদি তোমার এ ভাবে প্রজা শাসন করতে হয়, রতনপুরে নয়—তোমার যা' খুসি তুমি তোমার শেখরডিহিতে গিয়ে কর।

—না, শেখরডিহিতে নয়। এই রতনপুরের চৌধুরী বাড়ীতেই আমি প্রহ্লাদ বাগদীকে শায়েস্তা করব। পাইকদের দিকে ফিরে হুকুম দেয় মণিশঙ্কর :

—কী দেখছিস দাঁড়িয়ে? যা, নিয়ে যা একে!

—খবর্দার! ছেড়ে দে হতভাগারা! গর্জে উঠলেন গোলোকনাথ। সে গর্জন শুনে পাইকেরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! চম্‌কে উঠ্‌লেন নিজে মণিশঙ্কর!

—যা, এখান থেকে চলে যা।—দেওয়ানজির নির্দেশ পেয়ে লাঠি নামিয়ে প্রণাম করে নিঃশব্দে সরে গেল পাইক বরকন্দাজ। নিজের হাতে মুক্ত করে দিলেন গোলোকনাথ বন্দী প্রহ্লাদ বাগদীকে।

এক মুহূর্তের মধ্যে কী যেন একটা ভোজবাজী হয়ে গেল। যেমন করে সাপের মাথায় ধূলোপড়া দেয়, ঐ বৃদ্ধ গোলোকনাথ তেমনি অনায়াসে বশ করে ফেললেন সমস্ত পাইক বরকন্দাজকে!…প্রহ্লাদ বাগ্দীকে নিয়ে গোলোকনাথ সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন। মণিশঙ্করের ডাক শুনে তিনি ফিরে দাঁড়ালেন।

—পাইক বরকন্দাজ পর্যন্ত আমার হুকুম অমান্য করে চলে যায়, এত বড় দুঃসাহস হয় কি করে আমি বুঝতে পেরেছি গোলোকনাথবাবু! এর মূলে যে কে রয়েছে আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু এ অপমান আমি চুপ করে সইব না জানবেন, আজ হতে রতনপুরের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। অনুরাধাকে বলবেন—তার সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ আজ এইখানেই শেষ করে দিয়ে গেলুম্‌।

—তোমার স্ত্রীকে তুমি যদি ত্যাগ করো—সেকথা আমি তাকে বলতে যাব কেন?—ইচ্ছে হয়, নিজেই শুনিয়ে দিতে পার।…মণিশঙ্করের জবাবের অপেক্ষা না করে, প্রহ্লাদ নিয়ে গোলোকনাথ সেখান থেকে গেলেন কাছারী বাড়ীর দিকে।

মণিশঙ্কর একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। হাঁ, সে নিজেই শুনিয়ে যাবে অনুরাধাকে। আজই সব চুকিয়ে দিয়ে শেখরডিহি চলে যাবে। বাড়ীর ভেতর এসে অনুরাধাকে ডেকে পাঠাল। খবর পেল অনুরাধা নেই! চলে গেছে!…হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে গেল কাছারী বাড়ীর দিকে।

গোলোকনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে, সারা মুখে তাঁর কৌতুকের হাসি।
মণিশঙ্কর মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করে :
—অনুরাধা নেই !···এর অর্থ কি ?
—হতভাগ্য, তাও বুঝলে না ? লক্ষ্মীকে যে ত্যাগ করতে চায়, সে দুর্ভাগার মুখের কথা শোনবার আগে, মা লক্ষ্মী আপনা হতেই তাকে ত্যাগ করে চলে যায়।···গোলোকনাথ 'হা হা' শব্দে হেসে উঠলেন। গোটা কাছারী বাড়ীটা থর্থর্ কেঁপে উঠল তাঁর সেই অট্টহাসিতে।

গোলোকনাথকে সবাই জানে অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। তাঁকে হাসতে বড় একটা কেউ দেখেনি। আজকাল থেকে থেকে গোলোকনাথ হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠেন। সে হাসির শব্দ যে শোনে সেই ভয়ে চম্‌কে ওঠে।

শ্রীপতি চৌধুরী অনেক কাল আগেই গত হয়েছেন।
অনুরাধা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে হরিদ্বার।
মণিশঙ্কর সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফিরে গেছে শেখরডিহি।
দীপঙ্কর বাড়ীর কাছে এসেও, বাড়ীতে আসে না। সে থাকে কুসুমদিঘি বাগ্দী পাড়ায়।
রতনপুরের প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ী এক কালে আত্মীয় পরিজনে পূর্ণ হয়ে গম্ গম্ করত। দোল দুর্গোৎসবে, রাসের সময় এত জন সমাবেশ হত যে অত বড় বড় ঘরেও কুলোত না। বারান্দায় পর্দা খাটিয়ে অনেকের শোবার ব্যবস্থা করতে হত। আজ সে বাড়ী নিঝুম। মাত্র জনকতক দাসদাসী। আমলা কর্মচারী আর পাইক পেয়াদা যারা আছে তারাও থাকে বা'র বাড়ীতে। অন্দর মহল একেবারে খাঁ খাঁ করছে। এই জনহীন পুরীর এককালের উৎসব মুখর দিনগুলির

একমাত্র সাক্ষী হয়ে—ত্রিকালজ্ঞ ভূষণ্ডী কাকের মত আজও পুরী পাহারা দিচ্ছেন বৃদ্ধ গোলোকনাথ।

দিনের বেলা পূজা-আর্চা, জমিদারীর কাজকর্ম নিয়ে তবু একভাবে কেটে যায়। কিন্তু রাত্রি যেন আর কাটতে চায় না।

চিতলমারীর বিলের ওপারে তাল খেজুর আর আম বনের মাথায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে—গোলোকনাথের সারা মুখে যেন কালির ছোপ লাগে।···আবার রাত এল! আজকের রাতটা কি করে কাটবে এই পরম দুর্ভাবনা তাঁর কপালের বলিচিহ্নগুলিকে অধিকতর স্পষ্ট এবং বিবর্ধিত করে।

···দীপঙ্কর অনুরাধার সেই ছেলেবেলার পড়বার ঘর। অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকে পড়েন গোলোকনাথ। আলো জ্বালেন। দেয়াল-আলমারীর তাকে সেই পুরোনো গ্লোবটা—যে গ্লোব ঘুরিয়ে দীপঙ্কর অনুরাধাকে তার পৃথিবী-ভ্রমণের ইতিবৃত্ত বলত। ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস করেন গোলোকনাথ। ভূমণ্ডলের স্থানগুলি পড়তে চান্—সব যেন কেমন আব্‌ছা হয়ে আসে। আস্তে আস্তে গ্লোব ঘোরাতে থাকেন। ঘুরছে ···ভূমণ্ডল এমনি করে আবর্তিত হয়ে যাচ্ছে—এই আবর্তনের বেগে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে তাঁর বুকের দু'খানি ভাঙ্গা পাঁজর!···

টেবিলের ওপর মলাট ছেঁড়া, দু' ভাইবোনের মধ্যে কা'র যেন একখানা বই।···বইখানা হাতে নিয়ে চোখ বোলান গোলোকনাথ। প্রথম পাতা নেই, শেষের দিকটাও নেই। পুরানো এই পৃথিবীর মত। শেষ, সুরু দুই-ই হারিয়ে গেছে। গোলোকনাথের দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে ওঠে যেন মাঝখানের ছেঁড়া পাতা ক'টি।···বহু মূল্যবান্ দলিলের মত সযত্নে বইখানি দেরাজে তুলে রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন গোলোকনাথ।

ঊনশত সহোদর হারা দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে হস্তিনার শূন্য প্রাসাদের জনমানবহীন কক্ষে যেমন করে মহাকালের পদসঞ্চার শুনতেন,—গোলোকনাথও আজ তেমনি করে কান পেতে কী যেন শোনবার চেষ্টা করেন! অন্তহীন বিষাদের দ্বৈপায়ন হ্রদে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে দু' চোখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে নিকষ কালো আকাশের পানে তাকিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে 'হা হা' শব্দে অট্টহাসি হেসে ওঠেন। সেই হাসির শব্দে অন্ধকার আকাশ চৌচির হয়ে ভেঙ্গে চূরে একটু আলোর সংকেত কি চুইয়ে পড়বে না ওদিক থেকে?

দীপঙ্কর কুসুমদিঘিতে এসে বাগ্দীপাড়ার যেন নতুন রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। দু' বছর আগে যারা কুসুমদিঘি দেখেছে—তারা এ গাঁওকে চিন্‌তেই পারবে না। সারি সারি কুঁড়ে ঘর। গোলায় ভরা ধান। তকৃতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঙীনা। এতটুকু জঞ্জালের চিহ্ন কোথাও নেই। এঁদো পুকুর নেই। নেই কোথাও এতটুকু লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রের ছাপ। শস্য সম্পদে, অটুট স্বাস্থ্যে, অনাবিল আনন্দে উচ্ছল একখানি গ্রাম। নিপুণ শিল্পীর পটে আঁকা ছবির মত সুন্দর, নয়নাভিরাম কুসুমদিঘি।

গোলোকনাথ কুসুমদিঘির গল্প শোনেন। আনন্দে গর্বে তাঁর বুক ভরে ওঠে। কোনোদিন হয়তো বা নিজের এলাকায় পথ চলতে লুকিয়ে দূর থেকে কুসুমদিঘি সীমান্তের নতুন তৈরী রাস্তার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। একটু পরেই চমকে উঠে ফিরে আসেন। হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায় দীপঙ্করের সঙ্গে!

সারা অন্তর মথিত করা ব্যাকুল স্নেহ···সে যেন তাঁর চুরি করা বস্তু। ধরা পড়বার ভয়ে চোরাই মালের মত সন্তর্পণে সে স্নেহকে লুকিয়ে রাখেন। অপরাধীর মত সসঙ্কোচে ফিরে আসেন গোলোকনাথ। ছুটে গিয়ে দীপঙ্করকে বুকে জড়িয়ে ধরবার উদগ্র

কামনা—সে যেন তাঁর অধিকারহীন অন্যায় আকাঙ্খা। পরস্ব অপহরণ প্রবৃত্তি।...

দীপঙ্কর অবিশ্রাম কাজের মধ্যে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিয়ে রতনপুরের বিষয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে। জীবনের অতীত অধ্যায়কে শ্লেটের ওপর থেকে মুছে ফেলে সেখানে নতুন অধ্যায়ের চিত্র রচনায় ব্যস্ত রয়েছে।...আর রতনপুরের বিষয় ভাববেই বা কী? সে শুনেছে তার মা নেই, বাবা নেই। তাঁদের সম্বন্ধে সব চিন্তা ভাবনা চুকে গেছে। সন্তানের দায়িত্ব শেষ হয়েছে।...

অনুরাধা?...সে তো অগাধ ঐশ্বর্যের একমাত্র অধিকারিণী। কোথাকার এক মস্ত বড় জমিদারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে—সেটুকু খবরও বাগ্দীদের মুখে শুনেছে। সুতরাং জমিদারীর আয়তন দ্বিগুণ কিম্বা আরও বর্ধিত কলেবর হয়েছে। ঐশ্বর্যের মাঝখানে স্বামী সোহাগিনী হয়ে সে নিশ্চয় সুখেই আছে। উচ্ছল, প্রাচুর্যময় মুহূর্তগুলি তার পুষ্প সমারোহময় বাসন্তী রাত্রের মত সুমধুর। কুসুমদিঘির মাটির ঘরে ছেঁড়া মাদুরে বসে বাগ্দীদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে পড়াতে সেই রাজরাজেন্দ্রাণীর কথা ভাববার অবকাশই বা কোথায়, প্রয়োজনই বা কী।...

প্রহ্লাদকে যেদিন মণিশঙ্করের কবল হতে উদ্ধার করেন গোলোকনাথ, সে দিন তিনি প্রহ্লাদের দু'খানি হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন—মণিশঙ্করের সঙ্গে রতনপুর রাজবাড়ীর সম্বন্ধের কথাটি দীপঙ্কর যাতে না জানে। অনুরাধার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে দীপঙ্কর কী যে আঘাত পাবে—তা তিনি মনে মনে জানতেন।...প্রহ্লাদ সে কাহিনী তাই 'দেবতা'কে বলেনি। দীপঙ্করের বিশ্বাস অনুরাধা পরম সুখে আছে। শুধু একখানি মুখ—অসংখ্য কর্মব্যস্ততার মধ্যেও থেকে থেকে মনে পড়ে। সে মুখ বৃদ্ধ গোলোকনাথের। দীপঙ্কর তার মনের শ্লেট থেকে সব মুছে ফেলেছে, কিন্তু পারেনি শুধু ঐ মুখখানি মুছতে।

নূতন ভাবনার, নূতন কর্মের অসংখ্য চিত্রের মাঝখান থেকেও ফুটে ওঠে ঐ দুটি স্নেহাতুর চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি। কেন এমন হয়? রতনপুরের রাজাবাবুরূপে খেলাঘরের রাজগি শেষ হয়ে গেছে—বালিতে গড়া ঘর বালির সঙ্গে মিশে গেছে। 'চোখের বালির' মত তারই একটি কণা আজও কেন তার চোখে লেগে থাকে! মাঝে মাঝে চোখ জ্বালা করে জল আসে!

সে যাই হোক তবু দীপঙ্কর গোলোকনাথের সঙ্গে দেখা করেনি। যদি কোনোদিন তার উদ্‌যাপিত ব্রত সমাপ্ত করতে পারে—সার্থক করে তুলতে পারে মানুষকে মানুষের অধিকারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান করবার···মনের কোণে একটি গোপন আকাঙ্খা আছে, সেই দিন গিয়ে সে প্রণাম জানাবে গোলোকনাথের পায়ে।

আজকাল বাগ্দীরা সংগঠনের কাজে অনেকটা অভ্যস্ত হয়েছে। নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে অনেক কাজ করতে শিখেছে। তাই মাঝে মাঝে দীপঙ্কর একটু আধটু অবসর পায়। এবং অবসর পেলেই একখানি ডিঙি নৌকা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে বউডুবির খালে। নিজের হাতে বৈঠা ধরে অনেক দূর চলে যায়। সঙ্গে থাকে অমিতা। ···সেদিন তারা ডিঙি নৌকায় কুসুমদিঘি ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর চলে গেল। অন্ধকার হয়ে হ'ল। তবু দীপঙ্করের ফেরবার ব্যস্ততা নেই।

—এবার ফিরে চলুন: অমিতা বলে: রাত হয়ে এল যে!

দীপঙ্করের চমক ভাঙ্গে। ডিঙ্গির মুখ আস্তে আস্তে ঘুরে যায়।

—একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি দীপঙ্করবাবু।

দীপঙ্কর অমিতার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

—আপনি নিজে সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকেন, সবাইকে ব্যস্ত রাখেন। কোথাও এতটুকু ফাঁকি দেবার উপায় নেই।···কিন্তু এই বৌডুবির

খালে এলে আপনি যেন কেমন হয়ে যান্। বিশ্ব সংসারে আপনার কোনো কাজকর্ম নেই যেন। এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন যে আপনার দিকে তাকাতেও মাঝে মাঝে ভয় করে। কেন এমন হয় বলুন তো?

—বলতে পারি না অমিতা দেবীঃ দীপঙ্কর বলেঃ আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না। এই খালের সঙ্গে আমার যেন কেমন একটা যোগাযোগ রয়েছে। এ যেন আমাকে অলক্ষ্যে কেবলি টানে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেঃ

—জানেন, ছেলেবেলায় একবার এই বউডুবির খালে আমি এক অপরূপ নারীমূর্তি দেখেছিলুম। দুর্গা প্রতিমার মত! সেই মূর্তি আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। আমি জলের মধ্যে নেমে গিয়েছিলুম।···তারপরই তো কলকাতায় চলে এলুম আমি আর অনু।

অমিতার দুই চোখে অপরিসীম বিস্ময়। প্রশ্ন করলঃ

—এবার হরিদ্বার থেকে এখানে এলেন—সেও কি এই খালেরই আকর্ষণে?

—হতে পারে, বিচিত্র নয়।

—এবার কখনো কিছু দেখেছেন?

—সে শুনে লাভ নেই। আপনি বিশ্বাস করবেন না।

—না, না, বিশ্বাস করবো, আপনি বলুন। অমিতার কণ্ঠস্বরে প্রচুর আগ্রহ।

দীপঙ্কর বৈঠা তুলে মন্দস্রোতে ডিঙি নৌকা ছেড়ে দেয়। আস্তে আস্তে নৌকা আপনিই ভেসে চলে। আস্তে আস্তে বলে দীপঙ্করঃ

—অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে যখন—একা একা চলে আসি খালের ধারে।···নদীব ঢেউগুলি আমার সঙ্গে কথা বলে; মনে হয় সে ভাষা আমি বুঝতে পারি। হাওয়া নয়, ঠিক মানুষের তপ্ত নিশ্বাস আমার গায়ে এসে লাগে। কখনো দেখি বায়ুস্তরে সঞ্চরণশীল একটি

জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। হাত বাড়িয়ে তার অস্তিত্ব অনুভব করতে যাই—মূর্তি ধোঁয়ার মত পাতলা হয়ে বাতাসে মিশিয়ে যায়! মূর্তি ধরা ছোঁয়া দেয় না—অথচ একটা অলৌকিক স্পর্শানুভূতি আমার দেহের সমস্ত শিরায় শিরায় জেগে ওঠে। কেমন যেন আচ্ছন্ন করে' দেয়।

দীপঙ্কর থেমে গেল। মনের ভেতর তখন তার সেই গভীর রাত্রের অনুভূতির দোলা লেগেছে।···অমিতাও কথা বলে' তার চিন্তা স্রোতে বাধা দেয় না। অনেকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ। নৌকা আপনি ভেসে চলে। দূর গ্রাম প্রান্ত থেকে সহসা আওয়াজ আসে :

—দেব্‌তা—দেব্‌তা গো—

উৎকর্ণ হয়ে শোনে দীপঙ্কর, অমিতা।

—দেব্‌তা! দেব্‌তা গো—

হ্যাঁ, বাগ্দীমোড়লেরই গলার আওয়াজ।···তাড়াতাড়ি নৌকা বেয়ে দীপঙ্কর এগিয়ে যায় ঘাটের দিকে। কিনারায় আসতে প্রহ্লাদ নৌকার গলুই একহাতে টেনে ধরে, লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়ে। তারপর বৈঠা নিজের হাতে নিয়ে নৌকা চালাতে চালাতে চাপা গলায় বলে :

—দেব্‌তা, সেই শয়তান আবার এস্থে গ্যাছে!

—কে?

—নতুন জমিদার গো! আমাদের মেইয়েগুলান যে ঘাটে চান্ করে, সেই ঘাটের কাছে মস্ত বড় বজরা বাঁধিল। সঙ্গে আর দুটো নাও, তা'থে বন্দুকওয়ালা কতগুলান বরকন্দাজ আনিল।

মণিশঙ্কর সেই যে রতনপুর থেকে গোলোকনাথের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে, তারপর আর এদিকে আসেনি। নিজের ষ্টেট্ নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় ব্যস্ত ছিল।···প্রায় দু'বছর বাদে তার কি খেয়াল হয়েছে, তাই আবার এসে হানা দিয়েছে কুসুমদিঘির

বাগ্দী পাড়ায়। সেবার যে অপমান সহ্য করে নীরবে সে চলে গেছে এবার তার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবে। তাই বেশ তৈরী হয়েই এসেছে।

নৌকা বাঁক ঘুরতেই অনেকগুলি আলোর রশ্মি চোখে পড়ল। সুসজ্জিত বজরার জানালা দিয়ে তীব্র আলোকচ্ছটা নদীতরঙ্গের উপর বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। হাওয়ায় ভেসে আসছে গানের রেশ, ঘুঙুরের ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজ। বজরায় নাচগান পানোৎসবের ব্যবস্থাও হয়েছে তা হ'লে! মাঝে মাঝে হিন্দুস্থানী পাইকদের তীব্র হুঙ্কার শোনা যায়; নদীতে চলনদার নৌকাগুলিকে হুঁসিয়ার করে দেয় হুজুরের বজরা থেকে তফাতে সরে যেতে।

বজরার কাছে না গিয়ে তারা নেমে পড়ল অন্ধকার নদীতীরে। ঝোপের আড়াল থেকে একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসে। প্রহ্লাদ সুধায়ঃ

—কে বটে উখানে।

চাপা গলায় জবাব আসেঃ

—মোড়ল, আমি।

—কে! দেবা!

—হ্যাঁ, চন্দোরা লুকুয়ে সিথাকে গেল। দেবনাথ আঙুল দিয়ে বজরা দেখিয়ে দিল।···উটাকে ধরবো বুল্যে আমরা ঘাপটি মেরে বস্যে আছি।

চন্দোরা জমিদারের বজরায় কেন? তবে কি চার্ ফেলে মাছ ধরবার মতলব করেছে জমিদার?···

—দেব্‌তা, মা নক্ষী, তুমরা চল্যে যাও। উ শালা কতো রাত্তিরে আসবে কে বুইল্‌বে? যেখুনি আসবে আমরা আছি—মোড়ল রইছে, ধইর‍্যে হিড়্‌হিড়্ কর‍্যে টেন্যে লিয়ে যাবে!

—দেখিস্ কোনো ঝামেলা হয় না যেন!

প্রহ্লাদ জানাল কিছু ভাবতে হবে না। এমন নিঃশব্দে চন্দোরাকে তারা দীপঙ্করের কাছে নিয়ে হাজির করবে যে কাক পাখীটি টের পাবে না। প্রহ্লাদের আশ্বাস পেয়ে দীপঙ্কর অমিতাকে নিয়ে আশ্রমের পথে পা বাড়াল। কিন্তু দুশ্চিন্তা যেন শেষ হয় না! তাইতো, এতদিন পরে কেন এল ঐ অত্যাচারী জমিদার এই কুসুমদিঘিতে? চন্দোরাকে বজরায় নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যটা-ই বা কী?

কুসুমদিঘির স্নানের ঘাটে একখানি প্রকাণ্ড বজরা ভিড়েছে। বজরায় একটি সুন্দরী মেম সাহেব আর দুটি বাঙালী মেয়ে ছেলে আছে; বজরায় নাচগান হচ্ছে। খবর পেয়ে বাগ্দীপাড়ার ঝি-বউ কৌতূহলী হয়ে ছুটলো ঘাটের দিকে···টিয়া, বাতাসী, বিন্দি···সবাই। কিন্তু মাঝ পথেই আর এক খবর এল—বজরাটি নতুন জমিদারের। মেয়েদের হাসিঠাট্টা কর্পূরের মত উবে গেল। জমিদারের নাম শুনেই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর যে যার বাড়ী ফিরে গেল। বিদ্যুৎগতিতে কথাটা সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল। বাগ্দীরা লাঠি নিয়ে দল বেঁধে এগিয়ে চলে গাঙের দিকে। প্রহ্লাদ তাদের সতর্ক করে দিল, যেন কোন ঝামেলা না হয়। 'দেব্‌তা' ডিঙি বেয়ে বেড়াতে গেছে। আগে ফিরে আসুক, তার হুকুম না নিয়ে কিছু করা যাবে না। আর তা ছাড়া জমিদারের সঙ্গে বন্দুকধারী বরকন্দাজ আছে, অতগুলি বন্দুকের সামনে বোকার মত ওভাবে লাঠি নিয়ে এগিয়ে সুবিধে হবে না। দরকার হলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকা শুদ্ধ ওদের গাঙের জলে চুবিয়ে মারতে হবে। বজরার ওপর নজর রাখতে বলে প্রহ্লাদ চলে গেল 'দেব্‌তার' খোঁজ করতে।

বাগ্দীরা বনের মধ্যে লাঠি লুকিয়ে ফেলল। ভাল মানুষের মত

দু'চারজন ঘুরে বেড়াতে লাগল খালের ধারে ধারে। জনকতক সৌখিন ছোক্‌রা গান শোনবার জন্য খানিকটা এগিয়ে এল বজরার কাছাকাছি।···বজরার খোলা দরজার পর্দাটা দমকা হাওয়ায় উড়ে যায়। চোখে নেশা ধরায় তরুণী নর্তকীর বিলোল কটাক্ষ হেনে মদালস দেহ-ভঙ্গীমা।···ছোক্‌রা ক'টি পরস্পর গা টেপাটিপি করে হাসে।

ওদের ঔৎসুক্য মণিশঙ্করের দৃষ্টি এড়ায়নি। ললিতকে চুপি চুপি কী বলে। ললিত বেরিয়ে আসে। ছোক্‌রাদের ডাকে ঃ

—এসো না ভাই তোমরা। দূরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসে নাচ দেখ, গান শোনো।···আহা লজ্জা কিসের? হুজুর ডাকছেন তোমাদের। মাংস আছে, ভালো ভালো বিলিতি মদও আছে! চলে এসো—

আমন্ত্রণ করে ফল হ'ল বিপরীত। ছোকরাগুলি এতক্ষণ বিনা নিমন্ত্রণে অন্তরঙ্গের মত যদি বা অনেকটা বজরার কাছে চলে এসেছিল ; হুজুর ডাকছেন শুনেই এক মুহূর্ত পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে বোঁ করে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। নদীর ধারে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল— একটু পরে তাদের কাউকে আর দেখা গেল না।

ললিত বজরার ভেতরে এসে মুখ বিকৃত করে বলল ঃ

—নাঃ, এলো না, সব ব্যাটা পালিয়েছে।

—হুঁ।

মণিশঙ্করের মুখ গম্ভীর। নীরবে হাত বাড়িয়ে দিল পান পাত্রের দিকে।

বাগদীরা সবাই গা ঢাকা দেবার খানিক বাদে একটি লোক অত্যন্ত সন্তর্পণে কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা ফড়িংএর মত লাফাতে লাফাতে বজরার কাছে এগিয়ে এলো। একজন বরকন্দাজ পাশের নৌকা থেকে হাঁকল ঃ

—কওন্ হ্যায় !

লোকটা ঠোঁটে তর্জনী রেখে বরকন্দাজকে চেঁচাতে নিষেধ করল।

চাপা গলায় বলল ঃ

—হুজুর ডাকিছেন শুনলাম—তাই এয়েছি।

ললিত বাইরে এসে লোকটাকে তুলে নিল বজরায়।

—ভেতরে নিয়ে এসো ললিত।

মণিশঙ্করের নির্দেশ পেয়ে ললিত তাকে বজরার ভেতরে নিয়ে গেল।

—বোস্, তোর নাম কি ?

বজরার ভেতরকার জৌলুষ দেখে লোকটার তো চক্ষুস্থির ! এত রঙ বেরঙের জিনিষ পত্তর দিয়ে সাজানো ! দু'টি বাঙালী মেয়েছেলে—পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন সোনাদানায় মুড়ে দিয়েছে। আর জমিদারের পাশে, প্রায় তার গায়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে একটি মেমসাহেব। হাত, পিঠ, হাঁটু অবধি পা একেবারে খোলা। জমিদারের কাঁধের ওপর মাথা রেখে মেমটা তাকে লক্ষ্য করছে।

—তোর নাম কি রে ?

জমিদার আবার জিজ্ঞাসা করতে লোকটা থতমত খেয়ে একটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে জবাব দিল ঃ

—এজ্ঞে হুজুর, অধীনের নাম চন্দোরা ! এই কুসুমদিঘির পরজা।

—ওঃ ! তা' কি চাস্ তুই ?

এইবার লোকটা ফ্যালফ্যাল করে অসহায়ের মত তাকাল ঃ

—মানে ! তবে যে শুনলাম হুজুর নাকি ডাকিছেন ! মানে বিলিতি—···মণিশঙ্করের সঙ্গিনী ফিরিঙ্গী মেয়েটি ইতঃমধ্যে পানপাত্র পূর্ণ করে বিম্বোষ্ঠের কাছে তুলে ধরল। সেই দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটার কথা থেমে গেল।

মণিশঙ্কর হেসে উঠল। ললিতকে ইসারা করল—চন্দোরাকে পরিবেশন করতে।

—থাক্ থাক্ গেলাশ নয় হুজুর। যে বস্তুকে আপনার বলে জানি, তাকে আপন হাতে গেরহন্ করাই ন্যায্য!—বলে আঁজলা পেতে বসল চন্দোরা: ললিত বোতল থেকে ঢেলে দিল। আঁজলা পেতে কলের জল খাবার ভঙ্গীতে চোঁ চোঁ শব্দে চন্দোরা আধ বোতল সাবাড় করে দিল।

চন্দোরার মদ খাবার ভঙ্গী দেখে ফিরিঙ্গী মেয়েটি মণিশঙ্করের বুকের কাছে নড়ে বসল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বলল:

—জানোয়ারটার কাণ্ড দেখেছ! এখুনি যে সব ক'টা বোতল শেষ করে দেবে!

ভাঙ্গা হিন্দীতে মণিশঙ্কর জবাব দিল:

—আমি দেখেছি, একটা কুকুর এঁটো পাত খাচ্ছে দেখে আর একটার ঈর্ষা হয়। পাছে ফুরিয়ে যায় এই আশঙ্কা। তবে এক্ষেত্রে ভয়ের কারণ নেই। কারণ ভাণ্ডারে এখনো বহুৎ মাল মজুদ্ আছে।

চন্দোরা জমিদারের জবাব শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এঁটোপাতের কুকুর! এর একশ' ভাগের একভাগ অপমান করলেও বাগ্দীমেয়েরা ঝাঁটা দিয়ে মুখের বিষ নামিয়ে দিত। আর এতো শাদা চামড়া! এখুনি হয়তো একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে যাবে।···মেম্ সাহেব এক মুহূর্ত্ত মণিশঙ্করের কাছ থেকে ছিট্‌কে সরে গেল। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মণিশঙ্করের গায়ের ওপর। চন্দোরা ভাবলে হ'ল এবার! সাপিনী যেমন আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে সেইভাবে মণিশঙ্করকে বেষ্টন করে—মণিশঙ্করের ঠোঁটের কাছে ঠোঁট এগিয়ে নিল···। চন্দোরা দাঁত দিয়ে জিভের ডগা কামড়ে ধরে মুখ বিকৃত করে মাথাটা নামিয়ে নিল।

—ছিঃ।···

মণিশঙ্কর মেয়েটিকে সংগ্রহ করেছিল চৌরঙ্গী অঞ্চলের এক নৈশ-পানশালা হ'তে, যেখানে পানাসক্ত পুরুষেরা সঙ্গিনী করবে—দু'এক

পাত্র দয়া করে উপহার দেবে—এই আশায় প্রজাপতির মত সেজেগুজে বসে থাকে ঐ রকম বুভুক্ষু মেয়েরা। ওদের দেখলে মায়া হয়। চুপ করে বসে থাকে। একটু চোখ ইসারায় ডাকলে—কৃতার্থ হয়ে পাশে এসে বসে। যাকে বলে গোগ্রাসে গেলা···মণিশঙ্করের দয়ায় অঢেল পানীয়ের সন্ধান পেয়ে মেয়েটি এতদিন ওতেই ডুবে আছে। চন্দোরার রাক্ষুসে তেষ্টা দেখে ভয় হয়েছিল—পাছে আঁজলা পেতে সব শুষে নেয়।···মণিশঙ্কর তার নীচতায় চটে গেছে। বুঝতে পেরেই গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রভুকে আদর জানাল।···

গভীর রাত্রে চন্দোরা টলতে টলতে নেমে এল বজরা থেকে। নেশাটি বেশ জমাট হয়েছে। মণিশঙ্কর তাকে কাল আবার আসতে বলেছে। সঙ্গী আরও দু'চারজন যাকে পায় নিয়ে আসতে বলেছে। আর বলেছে সাহেব-কুঠির মামলায় সাক্ষী হতে হবে! আর বলেছে টিয়ার নাম—আর বলেছে—মাথার ভেতরটা কী যেন একটা কুমোরের চাকের মত বন্ বন্ করে ঘুরছে···সব এলোমেলো···জট পাকিয়ে যায়! যাক্‌গে! কিন্তু মেমটা ভারী বেসরম্···আর ঐ মেয়েগুলো—

—চন্দোরা!

কে যেন তাকে নাম ধরে ডাকে!

নাঃ, কে কোথায়! দিব্যি নেশা। চন্দোরা গুন গুন করে গান ধরে ঃ

"কুঁচবরণ কন্যা গো, মেঘবরণ চুল—"

মনে হ'ল কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুলের রাশী যেন একটি দড়ির মত শক্ত বিনুনী হয়ে তার গলায় জড়িয়ে গেছে। তাকে আলগোছে শূন্যে তুলে নিচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাবে? মেঘের দেশে নাকি! বিলিতি মদের ভারী মজা তো! শূন্য আকাশে তুলে নেয়!

হঠাৎ ঝুপ করে মাটিতে পড়ে যেতে তার হুঁশ হ'ল। মেঘবরণ চুলের বিনুনীতে নয়; বেড়াল ছানাকে যেমন করে—ঘাড় কামড়ে নিয়ে যায়—প্রহ্লাদ বাগ্দী সেইভাবে কালো হাতের মুঠোয় তাকে তুলে

এনে ছুঁড়ে ফেলেছে আশ্রম বাড়ীতে। সামনে দাঁড়িয়ে দেব্‌তা! আশেপাশে গাঁয়ের পনের বিশজন বাগ্দী।

—কেন গিয়েছিলি জমিদারের বজরায়—সত্যি করে বল!

চন্দোরা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল ঃ

—কি করব দেব্‌তা? তুমি তো সরাব তাড়ীর দোকান দেশ থেকে তুল্যে দিয়েছ! শুনলুম্ জমিদার বিলিতি মদ বিলোচ্ছে। তাই বুকের মধ্যিখানে কালপুরুষের রক্ত কেমন ছট্‌ফট্ করতি লাগল।

লাঠি ঠুকে ধমকে উঠল প্রহ্লাদ ঃ

—তোর কালপুরুষের রক্তের নিকুচি কচ্ছি। বল্ আর যাবি কিনা ওই শয়তানের বজরায়!

ধমক খেয়ে চন্দোরা আরও চেঁচিয়ে কাঁদে।

—লাঠি দেখ্যেছিস্ তো। মাথাটা দু' ভাগ কর্যে দিব। বল্ দেব্‌তার পা ছুয়্যে বল না কেন্যে, আর কখুনু যাবি ন্যে।

থাক্ থাক্,…দীপঙ্কর বলে ঃ

—ও আজ এখানেই থাক্। কাল সকালে সব শুনে যা হয় ব্যবস্থা করব। যা চন্দোরা, দাওয়ায় গিয়ে শুয়ে প'ড়।

চন্দোরা দীপঙ্করের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। বোবা কান্নায় তার ভূলুন্ঠিত দেহ বার বার ফুলে উঠতে থাকে!

সকালবেলা চন্দোরা ঘুম থেকে উঠতে তার কাছ থেকে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা গেল—তার সারমর্ম এই ঃ

—টিয়াকে জমিদারের হাতে তুলে দিলে জমিদার বাগ্দীদের ওপর কোনো জুলুম করবে না। টিয়াও শাড়ী গহনা পাবে, মেম সাহেবের মত আদর পাবে।…আর তা যদি না হয়, সাহেব-কুঠিতে দিনকতক আগে যে ডাকাতি হয়ে গেছে জমিদার বাগ্দীদের সেই মামলায় জড়িয়ে ফেলবে। এখন কোন্‌টা তারা চায়—ভেবে দেখুক্।

দীপঙ্কর স্থির করল, সে নিজে জমিদারের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু জমিদারকে পাওয়া গেল না। সন্ধান নিয়ে জানল—ভোরবেলা ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরে, না থানায়, না কোথায় যেন গেছে। কখন ফিরবে কিছু ঠিক নেই!

—তোরা ভাবিস্ নে। বাগ্দীদের ডেকে বলল ঃ

—বাড়ী গিয়ে নিজেদের কাজকর্ম করগে। জমিদার ফিরে আসুক, তার সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে নেব'খন।···আর শোন,—মেয়েরা আজ যেন কেউ স্নানের ঘাটে না যায়। বুঝেছিস্।

ইঙ্গিতে তারা জানিয়ে গেল, বুঝেছে সবাই।

সন্ধ্যার দিকে পরাণ বাগ্দী এসে খবর দিল—জমিদার ঘোড়ায় চেপে গাঁয়ের দিকে আসছে। সে দূর থেকে নিজের চোখে দেখে এসেছে। এর-ওর বাড়ীর ওপর দিয়ে সোজা রাস্তায় ছুটে এসেছে দেবতাকে খবর জানাতে। দীপঙ্কর এগিয়ে চলল। বাধা দিল অমিতা ঃ

—অত বড় পাষণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে একা যাবেন না দীপঙ্করবাবু। বাগ্দীদের জনকতক সঙ্গে নিন্।

—কী যে বলেন? বাংলাদেশের এক অত্যাচারী জমিদারকে যদি ভয় করে চলতে হয়—তার সঙ্গে দেখা করতে যদি 'বডিগার্ডের' দরকার হয়—তবে আমাদের এ পথে না আসাই উচিৎ ছিল।···

দীপঙ্করের ঠোঁটের কোণে এক বিচিত্র হাসি খেলে গেল। একা একা চলে গেল—জমিদার যে পথে আসছে সেই পথের দিকে।

অমিতা একটুকাল চুপ করে বসে থাকল। কেমন যেন একটা অস্বস্তি! নাঃ, দীপঙ্কর যাই বলুক, তাকে একা যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি।

—যা তো পরাণ, মোড়লকে খবর দে! সবাইকে ডেকে আন্—শিগ্গির।

পরাণ বাগ্দী ছুটে বেরিয়ে গেল।

শহরে কালেক্‌টরের সঙ্গে কতগুলি কাজ সারতে হয়েছে। থানায় খবর দিয়েছে মণিশঙ্কর—কুসুমদিঘির প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা। দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধাও বিচিত্র নয়। একটু সচেতন থাকতে হবে; খবর পেলেই যেন পুলিশ ফোর্স চলে আসে। এই সমস্ত কাজ কর্ম শেষ করে কুসুমদিঘি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে এল। সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। তাই আস্তে আস্তে চলেছে এবার গাঁয়ের পথ ধরে।

—শুনুন, আমার কিছু কথা আছে। সামনে এসে দাঁড়াল দীপঙ্কর। মণিশঙ্কর ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। চোখে তার জিজ্ঞাসা।

—আমি এখানকার বাগ্দীদের বিষয় কিছু বলতে চাই।

—ওঃ, তুমিই তা হলে বাগ্দীদের সেই 'দেবতা'! খানিকটা কৌতূহল ও ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল মণিশঙ্করের কণ্ঠস্বরে। ঘোড়ার রেকাব শুদ্ধ পা দুটো বার দুই দোলা দিয়ে মণিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল:

—তুমি এ বাগ্দীপাড়ায় আস্তানা গেড়েছ কেন? কী কাজ তোমার এখানে?

—ওরা বড় অসহায়। তাই ওদের যদি কিছু উপকার করতে পারি—

—উপকার করছ না তুমি—বাধা দিয়ে বলে মণিশঙ্কর—তোমার আস্কারা পেয়ে ওদের দেহে পুড়ে মরবার পালক গজিয়েছে।

—বংশ পরম্পরায় আধি ব্যাধিতে ভুগে মরবার চেয়ে এক সঙ্গে সবাই মিলে পুড়ে মরা ভাল নয় কি?

—হুঁ, সেই পুড়ে মরবার ব্যবস্থাই করেছ তুমি। ওরা যদি মরে, জেনো, তার জন্য ষোল আনা দায়ী তুমি।

—আমি!

—হ্যাঁ তুমি!...একটু জোর দিয়ে বলে মণিশঙ্কর: আচ্ছা, এতে কী লাভটা হচ্ছে বলো তো? ভেবে অবাক্ হই, এককালে যারা

আমাদের সামনে এসে কথা বলা দূরে থাক্—বাড়ীর ত্রিসীমানায় এসে দাঁড়াতে সাহস পেত না—আজ তোমার কাছে প্রশ্রয় পেয়ে তারা আমাদের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়। হয়তো একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতে চাইবে এবার।

—তাতে দোষ কি বলুন ?—স্থির কণ্ঠে জবাব দেয় দীপঙ্কর ঃ

—ওদের বাবুর্চি, খানসামা, বয় সাজিয়ে ওদের হাতের জিনিষ না খেলে আপনাদের একটি দিনও চলে না। অথচ যত আপত্তি আপনাদের ওদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে !

মণিশঙ্করের চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ পায়।

দীপঙ্কর বলে ঃ

—আপনাদের পোষা কুকুরটি পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে এক কৌচে বসবার অধিকার পায়, অথচ সে অধিকার পায় না কেবল এই নিরীহ মানুষগুলি। কেন, কিসের জন্য ওরা এ জুলুম সইবে বলুন তো ?

মণিশঙ্করের কথায় এবার বেশ রাগের ঝাঁঝ্ পাওয়া যায়।

—তুমি কি এই কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করবার জন্যই আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছ ?

লজ্জিত ভাবে মাথা নেড়ে বলে দীপঙ্কর ঃ

—না, না, কৈফিয়ৎ নয়। আপনাকে আমি দু' একটি অনুরোধ জানাতে চাই।

—কি প্রকার ?

—আপনি দয়া করে আপনার বজরা, আর সাঙ্গ-পাঙ্গদের ও ঘাট থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিন্। ওটা মেয়েদের স্নানের ঘাট।

—আর ?

—টাকা দিয়ে জমিদারী কিনেছেন—হিসেব মত খাজনা বুঝে নিন্। এর বেশী অন্তরঙ্গতা বাগ্দীদের সঙ্গে করতে চাইবেন না।...ওদের তো আপনি ঘৃণাই করেন। তবে কেন ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার

চেষ্টা করছেন? প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বজায় রেখে এখান থেকে চলে যান্।

ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পেরে মণিশঙ্কর অন্তরে উষ্ণ হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল :

—অন্তরঙ্গতা করব না! বেশ, অল্‌টারনেটিভ অর্থাৎ বিকল্প ব্যবস্থাও আমি করেছি। এইটুকু জেনে রাখ তা হলে।

কথা শেষ করে মণিশঙ্কর রওনা হবার জন্য লাগামে হাত দিল।

দীপঙ্কর সামনে থেকে বাধা দিল :

—বিকল্প ব্যবস্থা মানে, সাহেব-কুঠির ডাকাতির মামলায় ওদের জড়াতে চান্ আপনি।

চমকে উঠল মণিশঙ্কর :

—কে বলল তোমায় একথা?

—যেই বলুক,—আমার অনুরোধ আপনি এ কাজ করবেন না।

—আমার সময় সংক্ষেপ, পথ ছাড় বলছি।

মরীয়া হয়ে ওঠে দীপঙ্কর :

—আপনার জবাব না পেলে আমি কিছুতেই পথ ছাড়ব না।

চাবুক হাতে সোজা হয়ে বসল মণিশঙ্কর :

—ওঃ, জবাব চাই-ই তা হলে?

—হাঁ চাই।

—বেশ, তবে এই নাও জবাব।...কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের চাবুকটা একবার শূন্যে ঘুরিয়ে নিল।

'সপাং' করে আওয়াজ হল।...

দু' হাতে মুখ চেপে রাস্তার একধারে বসে পড়ল দীপঙ্কর। আর্তকণ্ঠে বলল :

—না, না, এ জবাব নয়। নিপীড়িত মানুষের চিরদিনের জিজ্ঞাসাকে এ হ'ল শুধু এড়িয়ে যাওয়া।

দীপঙ্করের কণ্ঠস্বর মণিশঙ্কর শুনতে পেল কিনা কে জানে। ঘোড়ার ক্ষুরে ধূলো উড়িয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাগদীরা দল বেঁধে ছুটে এসেছে।

—রক্ত! দেব্‌তার রক্ত!

আহত জানোয়ারের মত তারা এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল। লাঠি হাতে ছুটল সবাই জমিদারকে লক্ষ্য করে।

দীপঙ্কর ডাকল। অমিতা ডাকল।…কে শোনে তাদের ডাক? রক্তের আস্বাদ পাওয়া দলবদ্ধ বাঘের মত ভীষণ হুঙ্কারে জল, স্থল, আকাশ, পৃথিবী কাঁপিয়ে তারা দলে দলে মিলিয়ে গেল নৈশ অন্ধকারে। শুধু কোলাহল। শুধু গর্জন। কিছু বোঝা যায় না। অমিতার কাঁধে ভর্ দিয়ে এক ঝলক রক্ত মুছে ফেলে উঠে দাঁড়াল দীপঙ্কর।

—ঘোড়ার খুরের আওয়াজ না?

—হ্যাঁ, তাই তো।

ঘোড়া তীর বেগে ছুটে গেল তাদের সামনে দিয়ে। লাগাম রেকাব সব ছিট্‌কে পড়েছে কোথায় তার ঠিক ঠিকানা নেই। আর মণিশঙ্কর? …সে কোথায়? এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শিউরে উঠল দীপঙ্কর আর অমিতা।

কুসুমদিঘির বাগ্দীদের সম্মিলিত কণ্ঠের উন্মত্ত হুঙ্কার দূরাগত সমুদ্র গর্জনের ন্যায় ঘাটে এসে পৌঁছুল। ঐ ক্ষীপ্ত প্রায় মানুষগুলির দুর্দান্ত আক্রোশ এখনই বানের জলে ভাসিয়ে নেবে বজরা শুদ্ধ সমস্ত আরোহীকে। দশ বিশজন মানুষ হলে বন্দুকের সাহায্যে তাদের রুখে দেওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত বাগ্দীপাড়া ক্ষেপে উঠেছে। এখনি কাতারে কাতারে ধেয়ে আসবে হিংস্র প্রতিবিধিৎসু অসংখ্য

আততায়ী। বন্দুক হাতে নিয়ে পাইক বরকন্দাজ ক'টি থর থর করে কাঁপতে লাগল। আর্তস্বরে ক্রন্দন জুড়ে দিল নর্তকীদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনী। আর বিলম্ব করা উচিৎ নয়। মণিশঙ্কর পরিত্রাণ পায় —একদিন দেখা হবেই। এখন এই স্ত্রীলোক ক'টিকে রক্ষা করা সর্বপ্রকারে বিধেয়। তা ছাড়া প্রভুর অবর্তমানে বজরা এবং তার বহুমূল্য আসবাবপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তারই এইরূপ সদ্-বিবেচনা করে প্রভুভক্ত ললিতু আর অপেক্ষা না করে বজরা খুলে দিতে আদেশ দিল। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে বজরা তীর বেগে ছুটে চলল রতনপুরের দিকে।

পরদিন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী কুসুমদিঘি বেষ্টন করে ফেলল। মণিশঙ্কর শহরে কালেক্টর সাহেবকে আভাস দিয়েছিল। থানাতেও খবর দিয়ে রেখেছিল—প্রজা-বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে। বাগদীদের বিক্ষোভের মধ্যে রাজনীতির গন্ধও নাকি রয়েছে! তাই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে—সেই রাত্রেই রওনা হয়ে এল বেয়োনেট-চার্জকারী শান্তিরক্ষকেরা। গোটা গ্রামখানিকে বেষ্টন করে অত্যন্ত সন্তর্পণে বন্দুক বাগিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল পুলিশ ফোর্স। যে কোনো মুহূর্তে ঐ সাঙ্ঘাতিক মানুষগুলির সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হতে পারে—তাই এত সতর্কতা।

কিন্তু যাদের জন্য এত আয়োজন—তারা কোনো বাধা দিল না; প্রতিবাদও করল না। পুলিশের হাঁক ডাক শুনে দলে দলে এসে হাজির হল পুলিশের বড় কর্তার সামনে। এতবড় একটি বিদ্রোহীদল যে এভাবে আত্মসমর্পণ করবে—পুলিশের কর্তা ভাবতেই পারেন নি। ছুঁচো মারতে কামান দাগবার আয়োজন করেছিলেন মনে করে তিনি যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

রতনপুর থেকে দেওয়ানজি গোলোকনাথ এসেছেন পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে কুসুমদিঘিতে। মণিশঙ্করের মৃতদেহের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশের বড় কর্তার পাশে লাঠির ওপর দেহভার রেখে দাঁড়িয়ে আছেন গোলোকনাথ। অথচ কি কথাবার্তা হচ্ছে কিছুই তাঁর কানে আসছে না। দৃষ্টি তাঁর অর্থহীন, উদাসীন। এক সময়ে কানে এল পুলিশের বড় কর্তার হুঙ্কার ঃ

—ভাল চাস্ তো শিগগির বল,—কে খুন করেছে!

নিরীহ জীবগুলি কষাইখানার নির্বোধ প্রাণীর মত এ ও-র মুখে তাকায় শুধু।

—আর দেরি করতে পারব না। এই শেষ জিজ্ঞাসা করছি, জবাব না দিলে ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে সব শুদ্ধ চালান দেব। বল্—কে করেছে খুন ?

—আমি!

চম্‌কে উঠে সকলে ফিরে তাকাল যে দিক থেকে দৃঢ় কণ্ঠে জবাব এল সেই দিক পানে। দু'হাতে বাগ্দীদের ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল দীপঙ্কর।

পুলিশের বড় কর্তাকে সে জবাব দিল ঃ

—আমি খুন করেছি।

গোলোকনাথের চোখে চোখ পড়ল। শিউরে উঠলেন গোলোকনাথ। কপালে কাল রাত্রের চাবুকের আঘাতে এখনো শুক্‌নো রক্ত জমে আছে। বাঁ চোখটা ফুলে উঠেছে। জামা একদিকটা ছিঁড়ে গেছে, রাস্তার কাঁদা লেগেছে কাঁধের কাছে। এলোমেলো রুক্ষ চুল হাওয়ায় উড়ে পড়ছে কপালের কাটা জায়গাটায়। হাত দিয়ে চুলগুলিকে একবার সরিয়ে দিয়ে গোলোকনাথের পানে তাকাল। রতনপুরের সর্ব-অধিকার ত্যাগ করে চলে যাবার পর দু'জনের এই প্রথম দেখা। দীপঙ্কর আসামী ; আর সেই আসামী গ্রেপ্তার করাতে এসেছেন

গোলোকনাথ। চোখে চোখ পড়তেই গোলোকনাথ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

বাগদীদের দীপঙ্কর একটি কথা বলতে দেয়নি। সব দোষ, সব অপরাধ নিজের কাঁধে নিয়েছে। পুলিশ তখন তাকেই গ্রেপ্তার করল।

গোলোকনাথ একবার পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—ও যদি অপরাধী প্রমাণ হয়—কী শাস্তি হতে পারে!

—অনেক কিছুই হ'তে পারে।···তেমনি আস্তে আস্তে জবাব আসে ঃ

—ফাঁসিও হতে পারে।

—ফাঁসি!

রক্তহীন বিবর্ণ মুখ গোলোকনাথ ইন্‌স্‌পেক্টরের দিকে তাকালেন। দু'টি চোখের কোণে কী যেন চক্ চক্ করে উঠল। একটুকাল স্তব্ধ থেকে অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত অথচ চাপা গলায় যেন নিজের মনকেই ধমক দিয়ে বললেন ঃ

—হাঁ, তাই হোক! জেলে পচুক···তারপর ফাঁসি-ই হোক্!

সামনাসামনি দাঁড়িয়েছিলেন। এবার গোলোকনাথ পেছনে পুলিশ বেষ্টনীর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দীপঙ্করকে রওনা হতে হবে। অমিতার হাত ধরে তাকে এক পাশে নিয়ে গেল ঃ

—অমিতা দেবী, যাবার আগে একটি কথা বলে যাই। হরিদ্বারে ধ্রুবঘাটের রাত্রির কথা মনে পড়ে? বলেছিলেন, আপনি কাছে থাকলে আমার দিক থেকে যে দিন পালাবার তাগিদ না থাকবে—সেই দিন আপনাকে কাছে ডাকতে। পালাবার তাগিদ হয়তো আর ছিল না, তবে ফুলটিও যে নিঃশেষে ঝরে গেছে তা-ও বলতে পারি না।

ফুলের গন্ধে আজকাল উদ্‌ভ্রান্ত হতুম না, পেতুম নতুন কাজের প্রেরণা। ছড়িয়ে দিতুম নিজেকে সবার মাঝখানে।

দীপঙ্কর একটু থামল। তারপর অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে বলল ঃ

—আমি যে এদের জন্য কিছু করেছিলুম—তার সব প্রেরণা দিচ্ছিলেন আপনি। হয়তো আপনি নিজেও সে কথা এতটুকু জানেন না।

—জানি দীপঙ্করবাবু।···শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় অমিতা ঃ

—আপনাকেও আজ আমার একটি কথা বলা দরকার। পাহাড়ী পথে চলতে অজানা, অনির্দিষ্ট কোণ থেকে ফুলের গন্ধ পেয়ে আপনি ভুল করেছেন, বলেছিলুম সেদিন। আজ বলতে কুণ্ঠা নেই—সে দিন আমি মিছে কথা বলেছি। ফুল কোথায় ফুটেছে সে আমি জানি। দিনে, রাত্রে, প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে অনুভব করি সেই ফুল ফোটার ব্যথা। ···তবে আপনার আদেশ আমি কিন্তু একটুও ভুলিনি। ফুলন্ত ডালকে আমিও জ্বালানি কাঠ বলেই মেনে নিয়েছি। জ্বলে ছাই হয়ে ওদের জন্য দু'টো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারলেই আমার সার্থকতা।

পুলিশের তাগিদ এল রওনা হবার জন্য।

—আসি তবে! দায়িত্ব তোমার বেড়ে গেল অমিতা। তোমার নিজের কাজ এবং সেই সঙ্গে আমার টুকুও চাপিয়ে দিলুম তোমার কাঁধে।

—আশীর্বাদ কর, যেন সে ভার বইবার ক্ষমতা হয় আমার, কখনো যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ি।

অমিতা মাথা নত করে প্রণাম করল। দু'টি বড় বড় জলের ফোঁটা দীপঙ্করের পায়ের ওপর শ্বেত-পদ্মের অঞ্জলির মত নিবেদিত হল।

—না, আজকের দিনে তোমার চোখে জল নয় অমিতা। দু' হাতে তাকে তুলে নেয় দীপঙ্কর।···তুমি কাঁদলে, ওদের সান্ত্বনা দেবে কে? আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মূঢ়, অবোলা জীবগুলিকে।···

অমিতা গোপনে চোখ মুছে ফেলে বাগ্দীদের কাছে চলে গেল। প্রহ্লাদের গায়ে হাত বোলাতে লাগল ঃ

—কেঁদ না মোড়ল, 'দেব্তা' কাঁদতে বারণ করে গেছে। 'দেব্তার' হুকুম তোমরা কোন দিন অবহেলা করোনি। আজকের দিনে অবাধ্য হয়ে 'দেব্তার' প্রাণে কষ্ট দিও না।

পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে কুসুমদিঘি ছেড়ে মাঠ ভেঙ্গে চলে গেল দীপঙ্কর। বাগ্দীরা হুকুম মেনেছে! বুক ভেঙ্গে গেলেও কেউ তারা 'টু' শব্দটি করেনি। শুধু সকলের সব অনুরোধ, সব আদেশ উপেক্ষা করে' পাগলের মত চীৎকার করে কাঁদতে লাগল টিয়া।

বুড়ীকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে কাঁদে ঃ

—ও দিদি, কেন্যে আঁতুড়ে বিষ দিয়্যে মের‍্যে ফেলালি না আমারে। আমার লেগ্যে দেব্তা জেলে যায়। দেব্তা খেতে জনম নিলাম আমি রাক্ষসী।...

॥ উনিশ ॥

হৃষীকেশ আনন্দ আশ্রম—আনন্দময় হয়ে উঠেছে একটি শিশুর কলহাস্যে।

সেবানন্দ বলেন ঃ

—গঙ্গা যে তমসা হয়ে উঠল দিদি!

অনুরাধা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

সেবানন্দ হেসে ফেলেন ঃ

—ছেলেবেলায় ছোটদের রামায়ণ পড়ো নি? সেই যে—'বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে!'...গঙ্গার কালো জলের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে সেই তমসা নদীর কথা। অগ্নির মত পূত চরিতা জানকী

ঘোর বনে নির্বাসিতা। কুশীলব সসাগরা ধরণীর অধিশ্বরের সন্তান হয়েও বনচারী, গাছের বাকল পরেছে।···আমার আনন্দ-আশ্রমকে তুই বাল্মীকির তপোবন করে তুলেছিস্ দিদি। মণ্টু আমাদের সেই বনবাসী রাজকুমার।···

শিশু মণ্টুকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন সেবানন্দ। অনুরাধার চোখে মুখে আনন্দ ও মাতৃত্বের গর্ব যেন উপ্‌চে পড়ে।

সেবানন্দ অনুরাধাকে বলেছিলেন—রতনপুরে অন্ততঃ গোলোকনাথকে শুভ-সংবাদটি জানাতে। কিন্তু অনুরাধা তাতে রাজী হয় নি।

—না দাদা, কাজ নেই। খবর যে কোরে হোক হয়তো শেখর-ডিহিতেও পৌঁছে যাবে। তা'রা আসবে, তাদের বংশধরকে কেড়ে নেবার দাবি উপস্থিত করবে। দরকার কি ও সব ঝামেলায়? এই নির্জন পাহাড়ের ছায়ায় নামহীন, পরিচয়হীন আশ্রম-তরুটির মত ও বেড়ে উঠুক। আমার মণ্টু রাজা হোক্ এ আমি চাইনে দাদা। ও নিঃসম্বল দরিদ্র হোক; তবু যেন মানুষ হয়।

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলেন সেবানন্দ।

—বেশ তোর ইচ্ছাতে আমি বাধা দেব না বোন।—কাজ নেই তবে আমাদের মণ্টুর কথা আর কাউকে জানিয়ে। মণ্টু আমাদের আনন্দ-আশ্রমের মূর্তিমান আনন্দস্বরূপ হয়েই থাক।···

একটু দম নিয়ে আবার বলেন:

—তবে ভয় হয় দিদি, আমার নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে। এই শরীর নিয়ে কতদিন বাঁচব কে জানে? চিরটা কালই তো ওকে পাহাড়ে ধরে রাখতে পারবি নে দিদি? একদিন ও বড় হবে, পৃথিবীর পথে প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম করে চলতে হবে। সেই অনাগত ভবিষ্যতে দৈনন্দিন পথ চলবার সংগ্রাম ওকে এখানে কে শিক্ষা দেবে? কে নেবে ওকে তিলে তিলে গড়ে তোলবার দায়িত্ব? ···এক যদি—

সেবানন্দের মনে একজনের কথা উদয় হয়েছিল। কিন্তু অনুরাধা কী ভাববে—তাই মনে করে সেবানন্দ চুপ করে গেলেন। এ প্রসঙ্গ আর অগ্রসর হ'ল না।

সেবানন্দ কন্‌খল্ বেড়াতে নিয়ে এসেছেন অনুরাধা আর মণ্টুকে। পথে আসতে গঙ্গায় স্নান সেরে নিলেন। অগুন্তি মহাশোল মাছ কিলবিল করছে জলে; যাত্রীরা লাড্ডুর মত পাকানো ছাতু ছুঁড়ে মারছে জলে; গলা বাড়িয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মহাশোল সেই ছাতু খেতে জলের ওপরে ভেসে উঠছে। এতটুকু আশঙ্কা নেই ওদের। যাত্রীদের হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে খেতে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে মৎস্যরাজ্যে। সে যুগের আশ্রম-মৃগ, এ যুগে হরিদ্বারের নিঃশঙ্ক মহাশোল। অহিংসা আর সেবা-মন্ত্রে ওরা মানুষের আত্মীয় হয়ে উঠেছে।

অনুরাধা অনেকগুলি ছাতুর ড্যালা পাকিয়ে হাতে করে মাছগুলিকে খাওয়াচ্ছে। দেখে মণ্টুর ফুর্তি আর ধরে না।

আনন্দে ডগমগ হয়ে মাথা দুলিয়ে বলে—'আবা—' অর্থাৎ আবার।

অনুরাধা আর একটি ড্যালা হাতে নিয়ে জলের মধ্যে হাত ডোবায়; 'টুপ' করে মাছ এসে গিলে ফেলে।

খল্ খল্ করে হাসে মণ্টু। বলে ঃ 'আবা।'

সব ছাতু ফুরিয়ে গেল। মণ্টু যেতে চায় না, হাত-পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দেয়।

অনেক করে ভুলিয়ে আনতে হয় তাকে। ওই দিকে আরও মাছ আছে! অনেক ছাতু খাওয়ান হবে তাদের।

মণ্টু চুপ করে বড় বড় চোখদু'টি পাকিয়ে সামনের দিকে তাকায়—সেই অনেক বড় মাছগুলিকে দেখবার আশায়।

কনখলে নীলধারা। গঙ্গার অনেকটা বিস্তার এখানে। জলের মধ্যে অসংখ্য শিলাখণ্ড। আঘাত পেয়ে অজস্র ফেনোচ্ছ্বাস। নীলধারার পাশেই পুরাণে বর্ণিত দক্ষযজ্ঞভূমি। সেবানন্দ মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে বললেন ঃ

—এই সেই দক্ষযজ্ঞের স্থান। পতি-নিন্দা শুনে এখানেই সতীর দেহত্যাগ হয়েছিল। পাগল ভোলানাথ ছুটে এসে এখান থেকেই সতীদেহ উদ্ধার করে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

—এখানে আমায় নিয়ে এলেন কেন দাদা? আগে জানলে আসতুম না।

অনুরাধার কথা শুনে অবাক হয়ে তাকালেন সেবানন্দ।

—কেন দিদি?

—এখানে আসবার অধিকার আমার আছে কি?

ব্যাকুল দু'টি জিজ্ঞাসু নেত্র। পরম বেদনাময়ী সেই বিষাদ-প্রতিমার পানে তাকিয়ে সেবানন্দের দু'চোখ ছল্ ছল্ করে এল। সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে গাঢ় স্বরে বললেন ঃ

—অধিকার নিশ্চয়ই আছে দিদি। স্বামীর অন্যায় কাজের সঙ্গিনী হ'তে যদি—তা'হলে হয়তো এ প্রশ্ন জাগতে পারত। স্বামীকে ত্যাগ করেও তুমি পতিব্রতা! প্রণাম করো দিদি। আবার যদি জন্ম নিতে হয় প্রার্থনা জানাও সেদিন যেন আর এ অগ্নি-পরীক্ষার প্রয়োজন না হয়।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল অনুরাধা। সে প্রণাম যেন শেষ হতে চায় না। কী এক পরম শান্তির বাণী যেন শুনতে পেল সে সেখানকার মাটিতে কান পেতে শুয়ে। অনেক পরে যখন মাথা তুলল—চোখের কোলে জলের দাগ তখন শুকিয়ে এসেছে!

আশ্রমে ফেরবার সময় অনুরাধাকে মনে হল বর্ষণশেষ আকাশের মত অনেকটা হাল্কা, পরিষ্কার। মনের কোণের বহুদিনের সঞ্চিত ব্যথা

সঙ্কিত জিজ্ঞাসা—নীলধারার গায়ে সতীদেহ-তীর্থে নিবেদন করে এসেছে। এখন যেন বেশ সহজ গতিতে চলতে পার্চ্ছে অনুরাধা। রাত্রি ঘনিয়ে আসে, পথে অন্ধকার নামে। নামুক, অনুরাধার চোখে আলো রয়েছে। অন্ধকারকে আর ভয় নাই তা'র।

আশ্রমে ফিরে আসতেই রতুর মা খবর দিল দেওয়ানজি এসেছেন। কাকাবাবু! হঠাৎ?…তাড়াতাড়ি ছুটে গেল অনুরাধা মণ্টুকে রতুর মায়ের কোলে দিয়ে।

প্রণাম করতে করতে জিজ্ঞাসা করল ঃ

—কোনো খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ চলে এলেন কাকাবাবু!

গোলোকনাথ একটা জবাব দিচ্ছিলেন। রতুর মায়ের কোলে মণ্টুকে দেখে তাঁর মুখের কথা থেমে গেল। পরম বিস্ময়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন শিশুর দিকে।

অনুরাধা গোলোকনাথের অবস্থাটা বুঝতে পেরে হেসে ফেলল। মণ্টুকে আবার বুকে তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে তার নরম গাল দু'টি টিপে দিয়ে বলল ঃ

—বোকা ছেলে, পেন্নাম করতে হয়।

মণ্টু মায়ের কাছে প্রণাম করা শিখেছিল। তাড়াতাড়ি গোল গোল হাত দু'খানি জুড়ে কপালে ঠেকিয়ে তার নতুন আয়ত্ত করা বিদ্যার পরীক্ষা দিল।

অনুরাধা তার নরম কানের কাছে চুমু খেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল ঃ

—বলো, দাদু, নমো—

ঘাড় দুলিয়ে ঠোঁট উল্টে মণ্টু বলল ঃ

—ডা-ডু-উ, ন-মো—

গোলোকনাথ মণ্টুকে বুকের ভেতর জাপটে ধরলেন। ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তে লাগল দু'গাল বেয়ে।

—কেন জানাওনি মা, এতদিন কেন জানাওনি একথা যে এমন মানিক এসেছে…রতনপুর, শেখরডিহি আলো করতে।

—আগে জানলে কী করতেন ?

কৌতুকছলে জিজ্ঞাসা করে অনুরাধা ঃ

—কুল উজ্জ্বলকরা ছেলেকে বোধ হয় অমনি তার কুল উজ্জ্বলকরা বাপের কাছে নিয়ে যেতেন, তাই না ?…আপনার গুণধর বাবাজি তো একা একা সবদিক জ্বালিয়ে উঠতে পার্চ্ছিল না, এবার ওকেও ওর বাপের সঙ্গে জুটিয়ে দেবেন নাকি ?

মণ্টুকে তাড়াতাড়ি রতুর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন গোলোকনাথ। অসহ্য যাতনায় আর্তনাদ করে ওঠেন ঃ

—ওরে, না, না, বড় দেরি করে এসেছি মা। এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে বুকে পেলে হয়তো মণিশঙ্করের মন ফিরে যেত। ও কাছে থাকলে হয়তো আজ আর এ দুর্বিপাক ঘটত না।

অনুরাধার মুখের কৌতুক-হাস্য মিলিয়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে ঃ

—কি দুর্বিপাক ঘটেছে কাকাবাবু,—

—মা, মণিশঙ্কর—

গোলোকনাথ মাথা নত করলেন। হাতের ইঙ্গিতে রতুর মাকে জানালেন মণ্টুকে নিয়ে সরে যেতে।

—কি কাকাবাবু, চুপ করে কেন ? কি হয়েছে তাঁর বলুন ?

না বলে উপায় নেই। আর এই কথাটি বলবার জন্যেই না তাঁর এতদূরে আসা।

—সে আর নেই।

—নেই ?

—বিদ্রোহী প্রজারা তাকে খুন করেছে।

—খুন করেছে ! শেষে অপঘাতে মৃত্যু !

গোলোকনাথ তাড়াতাড়ি অনুরাধাকে ধরে ফেললেন।

একটু পরেই অনুরাধা যেন নিজেকে অনেকটা সামলে নিল।

—হাঁ, আমিও এই রকম একটা কিছু হবে আশঙ্কা করেছিলুম, মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখতুম, কালও শেষ রাত্রে দেখেছি। লক্ষ্মীর ব্রত করব, পিটুলী গুলে আলপনা দিচ্ছি, সাদা পিটুলী গোলা রক্তের মত লাল হয়ে যাচ্ছে।···স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর ঘুমাই নি।

অনেকক্ষণ শোকমুহ্যমান দু'টি প্রাণী সেই অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকল। তারপর এক সময় অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল ঃ

—দাদার কথা তো কিছু বললেন না কাকাবাবু? দাদা কেমন আছে?

গোলোকনাথ অন্ধকারে আহত জীবের মত চম্‌কে উঠলেন। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে বললেন ঃ

—দীপু?···ভালোই আছে তো!

অনুরাধার দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না তবু।

—ওকি কাকাবাবু? অমন করে বলছেন কেন? মুখ ফিরিয়ে নিলেন যে? শিগ্‌গির বলুন আমার দাদা কেমন আছে? কোথায় আছে সে?

ধরা পড়ে এইবার কবুল করতে হ'ল গোলোকনাথকে ঃ

—কোথায় আবার! হাজত বাস করছেন!

অনুরাধা আর্তনাদ করে ওঠে ঃ

—হাজত বাস!

—কুসুমদিঘির বাগ্দীরা মণিশঙ্করকে খুন করেছে। সেই বাগ্দীদের বাঁচাতে নিজে জেলে গেছে। দারোগার কাছে কবুল করেছে, বাগ্দীরা কেউ নয়, মণিশঙ্করকে খুন করেছে সে নিজে।

—বাগ্দীদের বাঁচাতে দাদা নিজে জেলে গেল। আর আপনি সব জেনে শুনেও দাদাকে জেলখানায় ফেলে রেখে কোন্ প্রাণে এখানে চলে এলেন কাকাবাবু?

গোলোকনাথের কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ ঃ

—আসব না তো তুমি আমায় কী করতে বলো ?···তার শিক্ষাতেই তো বাগ্দীদের আজ অতখানি দুঃসাহস হয়েছে! শ্রীপতি চৌধুরীর মেয়েকে যারা বিধবা করল, শ্রীপতি চৌধুরীর স্টেটের টাকাতেই আজ আমি সেই সব খুনে আসামীদের খালাস করব ? কেমন ?

অনুরাধা উত্তেজিত গোলোকনাথকে কোন বাধা দিতে সাহস পেল না। গোলোকনাথের স্বর আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঃ

—হতভাগা ছেলেকে বিলিয়ে দিয়েও শান্তি পেলুম না। আজীবন জ্বালাল। শেষে তোমার নোয়া সিঁদুর ঘুচিয়ে এখন নিশ্চিন্ত মনে ফাটক বাসে চলল! পচুক, হতভাগা পচুক সেই জেলখানায়। তুমি আবার বলছ, তাকে খালাস করে আনলেন না কেন ? তোমরা দুই ভাই-বোনে মিলে, আমার জীবনকে তো ভীষ্মের শরশয্যা করে তুলেছ। আর কি চাও ? এ বুড়ো হাড় তোমাদের আর কত অত্যাচার সইবে শুনি ?

অনুরাধা গোলোকনাথের অভিযোগের বুঝি কোনো জবাব খুঁজে পায় না। শান্তকণ্ঠে বলে ঃ

—থাক্ কাকাবাবু, আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। যা করবার এবার আমিই করব।

॥ কুড়ি ॥

দীপঙ্কর যেদিন পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে সেদিন বাগ্দীরা তার হুকুম মেনে চুপ করে ছিল। স্তরে স্তরে কালোমেঘ কুসুমদিঘিতে ছায়া সঞ্চার করেছিল, গর্জন বা বর্ষণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—'দেব্তার' মৌন-ইঙ্গিতে। কিন্তু আজ আর তারা 'দেব্তার' কোনো কথাই শুনবে না। তাদের 'দেব্তা' জেল থেকে খালাস পেয়ে এসেছে।

বাঁধ ভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাসের মত তাদের মনের বিপুল উল্লাস উৎসারিত হয়ে উঠেছে! পথে পথে দেবদারুপাতা ও পুষ্পস্তবক শোভিত তোরণ তৈরী হয়েছে। প্রতিটি বাড়ীর আঙিনায় মেয়েরা আলপনা এঁকেছে। কাড়ানাকড়া, শানাই ও মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনিতে গোটা গ্রামখানি মুখর হয়ে উঠেছে।···মেয়েরা দলবেঁধে গ্রাম্যদেবতা বুড়ো-শিবের পূজা দিতে চলেছে!···সবার আগে মঙ্গলঘট মাথায় নিয়ে চলেছে টিয়া। লাল টুক্‌টুকে একখানি নতুন তাঁতের সাড়ী পরেছে, ঐ সাড়ীর রঙের মত মনের আনন্দ তার উপ্‌ছে পড়ছে যেন! পথের যেদিকে তাকায়—ডাগর চোখ দুটি ঘুরিয়ে সেই দিকেই উচ্ছল প্রাণের সুধা বিলিয়ে দেয়।

সারা দিন উৎসব করে পড়ন্ত বেলায় মেয়েরা যে যার ঘরে গেছে ঘরের কাজকর্ম শেষ করতে। তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না শেষ করে মরদ্‌দের খাওয়াতে হবে। নিজেরাও যাহোক দু'টো খেয়ে নিতে হবে। রাত্রে রথতলায় কবিগান। কুসুমদিঘি আর ভাজন্‌ডাঙ্গা দুই গাঁয়ের কবির লড়াই। ভাজন্‌ডাঙ্গার নামকরা কবিয়াল বংশী হাজরা—বুক ভর্তি মেডেল ঝুলিয়ে গান গায়। আর কুসুমদিঘির হয়ে লড়াই করবে দেবনাথ। নতুন কবিগান শিখেছে দেবা। মেডেল না থাক—টিয়া ভাবে—রূপের জৌলুষ কি রূপোর চেয়ে কম দামী জিনিস? অমন বুকের ছাতি, অমন জোরদার্ মিঠে গলা এ মুলুকে কার?···টিয়া তাড়াতাড়ি উনুন ধরিয়ে ভাতের হাঁড়ী বসিয়ে দেয়।···প্রহ্লাদ মোড়ল নিজে গেছে রথতলায় আসর তৈরী হচ্ছে তার তদারক করতে। চাঁদোয়া খাটানো, সতরঞ্চি যোগাড় করা, আলোর ব্যবস্থা করা, কতো কাজ রয়েছে!

—জানো অমিতা,—মানমন্দিরের বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আস্তে আস্তে বলে দীপঙ্কর :

—উকিল সুধানাথবাবুর কাছে শুনলুম, আমাকে জেল থেকে বা'র করবার জন্য এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা, এ ক'দিন মুঠোমুঠো টাকা খরচ করেছেন। তিনি না এলে, সুধানাথবাবুর মুখেই শুনলুম, আমার অন্ততঃ পাঁচবছরের জেল হত নির্ঘাৎ। শুধু তাঁরই চেষ্টায়—

অমিতা জিজ্ঞাসা করে ঃ কিন্তু তিনি কে ? তাঁর কিছু পরিচয়—

মাথা নেড়ে বলে দীপঙ্কর ঃ

—কোনো পরিচয় জানাতে অস্বীকার করেছেন। আড়ালে থেকে সুধানাথবাবুকে কেবল টাকা জুগিয়েছেন।

সেই অপরিচিতা মহিলাকে সমস্ত মনপ্রাণ উজাড় করে ঢেলে দিতে ইচ্ছা করে অমিতার। কেমন করে একটিবার তাঁর দেখা পাওয়া যাবে ? চুপ করে বসে ভাবতে থাকে অমিতা।

দীপঙ্কর বলে ঃ

—শুনলুম আজই রাত্রের গাড়ীতে তিনি নাকি এদেশ ছেড়ে চলে যাবেন। সুধানাথবাবুর মারফৎ অনেক অনুরোধ জানাতে, তিনি যাবার আগে একবার দেখা করে যেতে স্বীকৃতা হয়েছেন।

—আজই চলে যাবেন তিনি ?…অমিতা বলে ঃ

—তবে তো তাঁর আসবার সময় হয়ে গেছে ! এই বেলা রওনা না হলে, রাত্রের গাড়ী ধরা যাবে না তো !

একখানি পালতোলা নৌকা এসে শিমুল গাছতলায় ভিড়ল। নৌকা থেকে নেমে এলেন একজন মহিলা। থানধুতি পরা নিরাভরণ দেহ ! শীতান্তের শেষ রাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের মত একটি শান্ত বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি। কাছে এগিয়ে আসতে দীপঙ্কর; অমিতা দু'জনেই চমকে ওঠে ঃ

—এ কি ! অনু !

নত হয়ে দীপঙ্করের পায়ের ধূলো নিতে নিতে অনুরাধা বলে ঃ

—যাবার আগে একটিবার দেখা করতে এলুম !

তা'হলে অনুরাধা আত্মগোপন করে এত টাকা জুগিয়েছে দীপঙ্করকে খালাস করতে! মণিশঙ্করের পরিচয় ইতঃপূর্বেই জানতে পেরেছিল দীপঙ্কর। মামলার সময় সুধানাথবাবুর বক্তৃতায় আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে শুনেছে মানুষটির স্বভাব প্রকৃতির বিশদ আলোচনা। সব জেনেও অনুরাধার কাছে তবু যেন মাথা তুলতে পারে না। অপরাধীর মত দ্বিধার সঙ্গে বলে ঃ

—আগে আমি কিছুই জানতে পারিনি বোন্। ভাবতুম—তুই বুঝি স্বামীর ঘরে সুখেই আছিস্। তাই তো কোনো খবর নিই নি। যদি একবারও জানতুম যে মণিশঙ্কর তোর স্বামী—

—তা'হলে কী করতে? অনুরাধা নিজেই জবাব দেয় ঃ

—এই হতভাগীর মুখ চেয়ে তাহলে তোমার ব্রত ধর্ম সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে। গ্রামশুদ্ধ এতগুলি মানুষকে সেই অত্যাচারীর কবলে সঁপে দিয়ে এখান থেকে সরে যেতে···এই তো?

দীপঙ্কর চুপ করে থাকে। অনুরাধা অমিতার দিকে তাকায়।

—দাদার কথা শোন্ ভাই অমি। দাদা এ কথা ভুলে গেছে যে, সে যদি রাজার ঐশ্বর্য ত্যাগ করে পথের ধূলায় এসে দাঁড়াতে পারে, তার বোন্ও এই ধূলো-মাটির দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে।

একটু থেমে যায় অনুরাধা। পথের ওধারের সোনালী ধানের ক্ষেতে ঢেউএর ওপর ঢেউ। সেই দিকে তাকিয়ে বলে ঃ

—সত্যিই ভাই, তোমরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছ। আমি সুধানাথ-বাবুর কাছে শুনেছি। পথে আসতে নদীর ধারের ঘর-বাড়ীগুলিও চোখে পড়ল। কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে ছন্নছাড়া দীন-দুঃখীদের অভাবের সংসারগুলিকে এমন ছন্দবদ্ধ কাব্যের মত সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা যায়। মনে হয়, এখানকার মাটিতে দাঁড়িয়ে যেন জীবন্ত প্রাণের স্পন্দন অনুভব করছি।

দীপঙ্কর বলে ঃ

—সে স্পন্দন তো তুই-ই জাগিয়েছিস্ দিদি।

—আমি!

—হাঁ, ঐ দেখ না!

আশ্রমের দেওয়ালে আঁটা সাইনবোর্ডটি দেখাল।

—মানমন্দির!

—হাঁ, এই মানমন্দিরের কল্পনা করেছিলি তুই, আর আমি দিয়েছি তাকে রূপ। এ মানমন্দির যে তোরই অনু।

—সত্যিই যদি আমার হয়, তাহলে এই মানমন্দিরের জন্য আমি যা করব—তুমি তাতে বাধা দেবে না?

—কেন বাধা দেব?

অমিতার হাত ধরে কাছে টেনে আনে অনুরাধা ঃ

—অমি, তুই সাক্ষী রইলি ভাই। দাদা বলেছে, মানমন্দিরের জন্য আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

অমিতা ঘাড় নেড়ে জানায় সে সাক্ষী হ'ল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞাসা করে ঃ

—বল্, তুই কি করতে চাস্?

—বিশেষ কিছু নয়। এই মানমন্দিরকে আরও বড় করে গড়ে তোলবার জন্য আমি এই জিনিস দিচ্ছি, নাও।...অনুরাধা একখানি দলিল নিয়ে এসেছিল, সেখানি দীপঙ্করের হাতে তুলে দিল।

দীপঙ্কর বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে ঃ

—কি এ!

—দানপত্র।

—দান পত্র!

—হাঁ, আমি একা বিধবা। আমার তো বেশী কিছু নেই। থাকবার মধ্যে ঐ এক রতনপুর ষ্টেট। সে ষ্টেট আমি তোমার হাতে তুলে দিলুম।

তীব্র প্রতিবাদ করে দীপঙ্কর। না, এ বস্তু সে কিছুতেই নিতে পারবে না।

অনুরাধা বলে :

—ষ্টেট আমি তোমায় ভোগ করতে দিচ্ছি না। এ ষ্টেটের যা কিছু আয় সে তুমি আমার মানমন্দিরের জন্য খরচ কোরো। আমার বাবা, ঠাকুরদার ইচ্ছা ছিল রতনপুর ষ্টেট দেবত্র হবে! আমার পরম সান্ত্বনা এই যে, দেবতার জিনিস এত দিনে আমি সত্যি সত্যিই দেবতাকে ফিরিয়ে দিতে পারলুম।

হতবাক্ দীপঙ্করের একখানি হাত অনুরাধা তার হাতে তুলে নিয়ে মিনতির সুরে বলে :

—আমাদের গৃহ-দেবতা রাধামাধবকে দিনে একটিবার হাতে করে তিল তুলসী দিও। আর এই দেবত্র থেকে রাধামাধবের অনাথ ছেলে-মেয়েদের দু' মুঠো খেতে দিও।

দীপঙ্কর জিজ্ঞাসা করে :

—রাধামাধবের সেবার ভারও আমাকে নিতে হবে?—কেন, কাকাবাবু?

—তিনি অনেক দূরে!···একখানি খামে আঁটা চিঠি বার করে অনুরাধা দীপঙ্করের হাতে দিল।

—কাকাবাবুর ওই চিঠিখানি পড়। তা'হলেই সব জানতে পারবে। আমি ততক্ষণ আর একটি কাজ শেষ করে আসছি।···

অনুরাধা এগিয়ে গেল নৌকার দিকে। মণ্টু রতুর মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনুরাধা তাকে বুকে তুলে নিল। বুকের ভেতর চেপে ধরে মাথায় চুমু খেল। চোখের জল ঝরে পড়ল মণ্টুর মাথায়।

—ওকি দিদিমণি, ভর সন্ধ্যেবেলা, সোনার চাঁদের মাথায় চোখের জল ফেলছ কেন? অকল্যাণ হবে যে!

—ওকে টিপ পরিয়ে, চোখে কাজল দিয়ে ভালো করে সাজিয়ে নিয়ে এসো রতুর মা।

মণ্টুকে আল্‌গোছে রতুর মায়ের কোলে তুলে দিয়ে অনুরাধা আবার ফিরে এলো মানমন্দিরে।

গোলোকনাথ এতদিনে দীপঙ্করকে তার সব পরিচয় জানিয়েছেন ঃ দীপঙ্কর তাঁর সন্তান! বউ-ডুবির খালের জলে ঘুমিয়ে আছেন—দীপঙ্করের মা। সেই সঙ্গে লিখেছেন যে জীবনের বহু দুঃখকষ্ট সয়েও মৃত বন্ধুর কাছে যে কথা দিয়েছিলেন—জীবনের শেষ ক'টি দিন তিনি সে কথার খেলাপ করতে পারবেন না। দুঃখে, দুর্দিনে তিনি অনুরাধার পাশেই থাকবেন বলে দেশ ত্যাগ করে চলে এসেছেন।

দীপঙ্কর চিঠি শেষ করে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। অনুরাধা এসে তার পাশটিতে দাঁড়াতে চোখ ফেরাল ঃ

—চিঠি পড়লুম বোন্।···কিন্তু তোকে কি যেতেই হবে? কোনমতেই কি এখানে থাকতে পারিস্ নে দিদি?

—আমার সব হিসেব নিকেশ তো বুঝিয়ে দিয়েছি! আর আমায় কোনো অনুরোধ কোরো না দাদা!···এবার আসি তা হলে।

দীপঙ্করের পায়ের ধূলো নিতে হাত বাড়াতেই দীপঙ্কর দু'হাত ধরে—তাকে কাছে টেনে নিল। কান্নায় কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।

—অনু, এমন সন্ন্যাসিনী হয়ে তুই আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবি দিদি! এ আমি কেমন করে দেখব!

—তুমিও তো একদিন আমার চোখের সামনে ঠিক এমনি করেই চলে গিয়েছিলে দাদা? সেদিন কিন্তু আমি চোখের জল ফেলে তোমায় আটকে রাখতে চাইনি। আশীর্বাদ করো, জীবনে আর যেন কখনো পথ ভুল না করি। পরম দুঃখের দিনেও চোখের জল এসে যেন আমার দৃষ্টিকে ঝাপ্‌সা করে না দেয়।

রতুর মা মণ্টুকে নিয়ে এল। তাকে কোলে নিয়ে রতুর মাকে আবার নৌকায় পাঠিয়ে দিল অনুরাধা। দীপঙ্করকে বলল ঃ

—যাবার সময় তোমাকে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। বল, আমার শেষ মিনতিটুকু রাখবে ?

—রাখব দিদি ! বল, আমায় কি করতে হবে ?

—তোমার এই মানমন্দিরে যে সব অনাথ আতুরদের প্রতিপালন করবে, এই শিশুটিকেও তাদেরই সঙ্গে পালন কোরো। ওকে মানুষ করে গড়ে তুলো। দুঃখ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে ও যেন সত্যিকারের মানুষ হতে শেখে। এর বেশী কামনা, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আজ আর আমার কিছুই নেই।

—তাই হবে দিদি, আমি এর ভার নিলুম।

অনুরাধা ঘুমন্ত মণ্টুকে তুলে দিল দীপঙ্করের কোলে ! মণ্টু অনুরাধার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল। এতক্ষণ দীপঙ্কর তার মুখ দেখতে পায়নি। কোলে নিয়ে ঈষৎ অন্ধকারে মুখখানি দেখে একবার চমকে উঠল। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ঃ

—এ কে ? এ কে রে অনু !

—বলেছি তো, অনাথ, আতুর। পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। তার বেশী কোন পরিচয় নেই ওর।

অনুরাধা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। পালিয়ে যাবার মত ছুটতে ছুটতে এসে নৌকায় উঠল। মাঝিকে বলল, শিগ্গির নৌকা খুলে দিতে।

দীপঙ্কর কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয় কোথায় যেন মস্ত বড় একটা ফাঁকি থেকে গেল।

অমিতা মণ্টুর মুখখানি তুলে ধরে দীপঙ্করকে বলল ঃ

—ঘুমন্ত ছেলেটির মুখখানি দেখুন তো ! ঠিক যেন অনুরাধার···।

চমকে ওঠে দীপঙ্কর ! তাই কি !—মা হয়ে রাজদুলালকে আজ

অনাথ আশ্রমে দান করে গেল অনুরাধা! মন্টুর গালে গাল রেখে যেন আপন মনেই বলে দীপঙ্কর ঃ

—তোকে আমি মানুষ করে গড়ে তুলব খোকোন্ সোনা। তোকে মানুষ করা আমার ব্রত।

—এইটুকু ছেলে মায়ের কোল ছেড়ে থাকবে! পারব কি আমরা ওকে মানুষ করতে?

দীপঙ্করের কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের ধ্বনি জেগে ওঠে ঃ

—নিশ্চয়ই পারব অমিতা। আমার মা একদিন আমাকে বাঁচিয়ে রেখে এই বউ-ডুবির খালে হারিয়ে গিয়েছিলেন। ওর মা আজ হারিয়ে গেল। কিন্তু আমি জানি, ও নিশ্চয় বাঁচবে। আমার মায়ের বিদেহী আত্মা আজও ঘুরে বেড়ায় এই খালের ধারে···সব মায়ের, সব খোকনের কল্যাণ কামনা করে'। এখানে ও বাঁচবে! এখানে ও মানুষ হয়ে বাঁচবে।

মুণ্টুকে বুকে নিয়ে দীপঙ্কর, অমিতা নদীর পানে তাকায়। দূরে পাল তুলে মিলিয়ে যায় অনুরাধার নৌকা। বউডুবির খালের ধারে একটি একটি করে প্রদীপ জ্বলে ওঠে। সেই আলোর শিখা দেখতে আকাশে চোখ মেলে একটি একটি করে সন্ধ্যা-তারা। মায়েরা গান গায় মাটির প্রদীপ হাতে। সে গান নির্জন নদীতীর ছাপিয়ে শূন্যে উঠে যায়। স্তব্ধবিস্ময়ে শোনে দূর সপ্তর্ষিমণ্ডল॥

শেষ